সেপ্টেম্বর ২০২৩ ■ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণতঃ ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমা পানি

পরিত্যক্ত বোতল/পলিথিনে জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ায় ও বংশবিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশেপাশে যে কোন জায়গায় পানি জমতে না দেয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিস্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারী শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

সেপ্টেম্বর ২০২৩ ❑ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩০

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকায় পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট অংশের উদ্বোধন করেন– পিআইডি

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২৩। সময়ের এক সাহসী নারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৪৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটানা তিন মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। এ সময়টাতে তাঁর সাহসী পদক্ষেপ দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে গেছে। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ, সফল রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশের আলোকবর্তিকা। এ নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে কয়েকটি প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনা। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন গঠন করেন। তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা এ শিল্পের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। সাক্ষরতা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। সাক্ষরতায় রোল মডেল বাংলাদেশ। এ সংখ্যায় এ বিষয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ।

২৮শে সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সর্বস্তরে দুর্নীতি দূরীকরণের লক্ষ্যে সর্বোপরি স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালিত হয়। এ সংখ্যায় এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

শরৎ ও কাশফুল একসূত্রে গাঁথা। কাশফুল আর নীল আকাশ শরতের বার্তা পৌঁছে দেয়। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের নিবন্ধ, গল্প, কবিতা আর রয়েছে নিয়মিত বিভাগ। আশা করছি, *সচিত্র বাংলাদেশ* সেপ্টেম্বর সংখ্যাটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবন ৪
অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

'সেপ্টেম্বর' হোক শেখ হাসিনাকে মূল্যায়নের বিশেষ মাস ৯
ড. মিল্টন বিশ্বাস

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় শেখ হাসিনার অবিচল যাত্রা ১১
প্রফেসর ড. প্রণব কুমার পান্ডে

আকাশপথে বিরতিহীন আটলান্টিক পাড়ি ১৩
ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ

ক্যামেরা আবিষ্কার ও চলচ্চিত্র: চলচ্চিত্রের আবির্ভাব যেভাবে ১৬
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনে তথ্য অধিকার সচেতনতা ১৯
পরীক্ষিৎ চৌধুরী

পর্যটনশিল্প খুলে দিতে পারে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন দ্বার ২২
মাহবুব রেজা

ছোট্ট রানি থেকে বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ২৫
বিনয় দত্ত

স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নারীরা ২৭
আফরোজা নাইচ রিমা

বাংলাদেশে পর্যটন উন্নয়ন কর্মসূচি ২৯
প্রাচ্য পলাশ

সারা দেশে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ, সতর্কতা জরুরি ৩২
ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

ছেলে বা মেয়ে নয় সন্তানই হোক পরিচয় ৩৪
জেসমিন বন্যা

সাক্ষরতায় রোল মডেল বাংলাদেশ ৩৫
সুস্মিতা চৌধুরী

শরৎ এসে গেছে ৩৭
শারমিন ইসলাম

পরিবেশ রক্ষায় ওজোন স্তরের গুরুত্ব ও করণীয় ৩৯
রূপায়ণ বিশ্বাস

গল্প

সোনার মেয়ে আলো ৪১
নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর

কবিতাগুচ্ছ ৪৪-৪৭

শেখ সালাহ্উদ্দীন, চিন্ময় রায় চৌধুরী, তাহমিনা কোরাইশী, মিলি হক, শচীন্দ্র নাথ গাইন, কাজী সুফিয়া আখ্তার, আতিক রহমান গোলাম নবী পান্না, নুরুল ইসলাম বাবুল, শাফিকুর রাহী, ওমর ফারুক নাজমুল, রুহুল গনি জ্যোতি, রকিবুল ইসলাম

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৮

প্রধানমন্ত্রী ৪৯

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫১

উন্নয়ন ৫৩

ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৩

শিক্ষা ৫৫

নারী ৫৬

অর্থনীতি ৫৭

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৫৮

কৃষি ৫৯

পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৯

সামাজিক নিরাপত্তা ৬০

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৬১

ক্রীড়া ৬২

শ্রদ্ধাঞ্জলি :

না ফেরার দেশে কাজী পেয়ারার উদ্ভাবক ড. বদরুদ্দোজা ৬৩

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকা ওয়েবসাইট থেকে পিডিএফ পড়তে QR কোডটি স্ক্যান করুন:

ফেসবুক লিংক:
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
E-mail: dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এস.আর. প্রিন্টিং প্রেস লিঃ
৮৫/১ নয়াপল্টন, ঢাকা

হাইলাইটস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন ২৮শে সেপ্টেম্বর। তদানীন্তন গোপালগঞ্জ মহকুমার দক্ষিণে পাটগাতী ইউনিয়নের ঘাঘর ও মধুমতী নদীবিধৌত এলাকার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেন শেখ হাসিনা। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছার জ্যেষ্ঠ সন্তান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর মতোই দেশকে ভালোবাসেন গভীরভাবে। তাঁর স্বপ্ন দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বজন হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করেন। তিনি টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠার অভিলক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণের পর থেকে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলকে সুসংগঠিত করেন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে। শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ উন্নয়নের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছে এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের গৌরব অর্জন করেছে। বাংলাদেশ 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত। দৃঢ়চেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করেন। পদ্মাসেতু বাংলাদেশের সক্ষমতা, আত্মমর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক। তিনি উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অসংখ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, অর্জন করেছেন সম্মান ও মানুষের ভালোবাসা। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, সফল রাষ্ট্রনায়ক, সুলেখক, সংস্কৃতিমান ও উন্নয়ন-অগ্রগতির আলোকবর্তিকা। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী শেখ হাসিনাকে নিয়ে লেখা হয়েছে– নিবন্ধ, প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া ও গান। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে 'শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবন' এবং 'সেপ্টেম্বর হোক শেখ হাসিনাকে মূল্যায়নের বিশেষ মাস', 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় শেখ হাসিনার অবিচল যাত্রা' শীর্ষক প্রবন্ধ/নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা– **৪, ৯, ১১**

শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবন

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এটি দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক অবস্থান, তবে তাঁর রাজনীতি করার ইচ্ছে ছিল কি না, তা তাঁর ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের গভ. ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সে সাল থেকে ৬ দফা আন্দোলনে সংযুক্তি, ১৯৬৭ সালে শিল্প ও সাহিত্য সংঘে সম্পৃক্ততা, রোকেয়া হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পদ গ্রহণসহ ১১ দফার আন্দোলন থেকে কিছুটা হলেও আঁচ করা গিয়েছিল। তবে কবে তিনি দলের রাজনীতি বা নির্বাচনি রাজনীতিতে অবতীর্ণ হতেন, তা নিশ্চিত করে আমাদের পক্ষে বলা অসম্ভব। অনুমান করতে পারি, বঙ্গবন্ধু পরিণত বয়সে রাজনীতি থেকে অবসর নেবার পরই শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে রাজনীতিতে আসতেন।

১৯৬২ সালে তিনি অগ্রণী স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলনে তিনি সতীর্থ বা সমর্থকদের নিয়ে কৌশলে স্কুল থেকে বের হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসতেন। আসার পথে সবাই মিলে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিতেন, শেখ মুজিবের কন্যা হিসেবে কর্তা ব্যক্তিরা চিনতেন। তারা দেখেও ক্ষেত্রভেদে না দেখার ভান করতেন। এই আন্দোলনের সাথে ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ ফজলুল হক মণি, শাহ আতিয়ারসহ অনেকে জড়িত ছিলেন। ওয়াজেদ মিয়া এফ এইচ হলের ভিপি হিসেবে এই আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। এক পর্যায়ে আন্দোলন হাঁটু গেড়ে বসে যাচ্ছিল প্রায়। ওয়াজেদ মিয়া নেতিয়ে পড়া আন্দোলনকে জিয়িয়ে তুলেছিলেন। সকলের কাছে আন্দোলন তিন বছরের বদলে দু'বছরে ডিগ্রি প্রবর্তনের আন্দোলন ছিল কিংবা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুক্তির আন্দোলন ছিল, কিন্তু শেখ মুজিবের কাছে ছিল তা তাঁর ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্টের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় দেশ স্বাধীন না করা গেলে সশস্ত্র পন্থায় পাকিস্তানকে বধ করার মানবিক পর্বের প্রথম দিককার বিশেষ একটি প্রয়াস। শেখ মণির সাথে শেখ হাসিনার সংযোগ থাকলেও অন্যদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল নিতান্ত ক্ষীণ। সেদিনের সংস্কৃতিটাই ছিল তেমন। ছাত্রলীগে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল নগণ্য।

শেখ হাসিনা অগ্রণী স্কুল থেকে ১৯৬৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। সে পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন ছিল আইয়ুব খান বন্দনার আনুষঙ্গিকে ভরা। এই প্রশ্নের জবাব তিনি সম্পূর্ণ বাদ দিলেন। পরীক্ষায় ফেলের ঝুঁকি নিয়েছিলেন শুধু নিজের বিশ্বাস ও প্রত্যয় নিয়ে। যদিও তিনি সাফল্যের সাথেই কৃতকার্য হয়েছিলেন। পাকিস্তান ও তার শাসকদের প্রতি কী ধরনের ঘেন্না বা বিতৃষ্ণা থাকলে এসএসসি পরীক্ষার্থী হাসিনা এমনটি করতে পেরেছিলেন, তা গভীরভাবে বিবেচ্য।

শেখ হাসিনা কলেজে ভর্তির পূর্বেই ৬ দফা আন্দোলন নিয়ে পারিবারিক সার্কেলে আলাপ-আলোচনা হতো। শেখ মুজিব বাঘের পিঠে চড়তে যাচ্ছেন, এ কথা ফজিলাতুন নেছা জানলেও তিনি জানতেন না, এটা হলফ করে বলা যায় না। তিনি হয়ত শুনেননি কিন্তু দেখেছেন এবং ক্রমান্বয়ে দেখেই মুক্তির জন্যে একটি ট্রাম্প কার্ড ব্যবহার করতে যাচ্ছেন।

গভর্নমেন্ট ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বা তৎকালে চেনা নাম ইডেন ইন্টারমিডিয়েট কলেজে তিনি ব্রতী হয়ে রাজনীতির সাগরে প্রাতিষ্ঠানিক অবগাহনে সুযোগ পেলেন। ঐ কলেজে ১৯৬৬-১৯৬৭ সালে ছাত্রী সংসদ নির্বাচনে তিনি ভিপি প্রার্থী হলেন। তাঁর জেতার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। কেননা সে সময়ে গভ. ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ছাত্রলীগের ভিত্তি ছিল অতি দুর্বল। প্রতিপক্ষ ছিল ছাত্র ইউনিয়ন আর তার ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। তারপর তিনি প্রার্থী হলেন। তখন ৬ দফা আন্দোলন তুঙ্গে উঠে অনেকটা ঝিমিয়ে গিয়েছিল। শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতারা আইয়ুব-মোনায়েমের কারাগারে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের অবস্থা ছিল নিরন্তর থমথমে। একটি কাক-পক্ষী উড়ে গেলে তার পাখার শব্দ শুনা যেত। একটা পাতা ঝরে পড়লে মনে হতো ছোটোখাটো বাজ-পতনের মতো। শেখ হাসিনা সিদ্ধান্ত নিলেন প্রার্থী হবেন, আর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এটাকে একটি ইস্যু করার। ইস্যুটি হলো ৬ দফার পক্ষে ছাত্রীদের সমর্থন। বিপুল ভোটে শেখ হাসিনা নির্বাচিত হলেন, আর আমরা তাঁকে ধরে নিলাম ৬ দফার প্রাথমিক বিজয়। ৬ দফা ছিল বাঙালির মুক্তিসনদ।

কলেজের ভিপি হিসেবে তিনি ৬ দফা আন্দোলনকে গতিদান করেছিলেন, যা ছাত্রলীগের ভিত্তি নির্মাণে সহায়ক হয়েছিল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন ১৯৬৭ সালে। ছাত্রীদের কোনো হলেই ছাত্রলীগের কমিটি করার সামর্থ্য ছিল না, নির্বাচনে জেতা তো সুদূর পরাহত। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি ছিলেন রোকেয়া হলের অনাবাসিক ছাত্রী। তাঁর সাথে পেয়ে গেলেন বেশ কজনকে যারা

পরবর্তীতে সংস্কৃতি জগতে প্রচুর নামধাম কুড়িয়েছিলেন। রোকেয়া হল ছাত্রলীগের তিনি হলেন সাধারণ সম্পাদিকা। সে সময়ে শুধু রোকেয়া হলে প্যানেল দেবার সামর্থ্য নয়, বেশ কয়েকটা পদে তাঁর দেওয়া প্রার্থীরা জয়ী হলো। জয়ী যারা হলেন বা নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন তাদের মধ্যে ছিলেন কবি কাজী রোজী, সংগীত শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন, নিলুফার ইয়াসমিন প্রমুখ। পরবর্তীতে তাদের সমন্বয়ে শিল্প ও সাহিত্য সংঘের পুনর্জীবন দেওয়া হলেও পদ-পদবিহীন নেত্রী হিসেবে কাজ করেছেন নিরন্তর। ৬ দফা-পরবর্তী অবদমিত ছাত্রলীগের খানিকটা হলেও এ সংগঠনে স্থান করে নিয়েছিল।

তারপর বিবাহ ও বিদেশ গমনহেতু তাঁর রাজনীতি ও পড়াশুনায় ভাটা পড়ল; কিন্তু শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় নীত হলে তিনি ও তাঁর মা ফজিলাতুন নেছা মুজিব রাজনীতি প্রসারে গেরিলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। অতি সংগোপনে মা-মেয়ে ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনের প্রচণ্ডতা আনয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করলেন। ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনে তাঁর সম্মুখ সারির ভূমিকার কথা ভোলার নয়। বটতলায় টিয়ার গ্যাসের আঘাতে তিনি খানিকটা আহত হয়েও ছাত্রীদের কমনরুম থেকে বার বার কাপড় ভিজিয়ে লড়াকু ভাইদের টিয়ার গ্যাসের যাতনা লাঘব করেছিলেন। এই সফল আন্দোলনের পর তিনি অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন। তারপর মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা; হয়ত সংসারধর্মের প্রতি মন দিয়েছিলেন অনেকটা। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ও রাষ্ট্রপতি বা জাতির পিতার কন্যা হয়েও তিনি, তাঁর ভাইবোনরা এবং মা ছিলেন অনেকটাই আড়ালে। এ কথা সবারই জানা যে, ১৯৭৫ সালে তিনি রেহানাসহ স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সাথে জার্মানিতে ছিলেন, অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদে, শোকে ম্রিয়মাণ হলেন, ভেঙে পড়লেন না। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা পুনর্গঠনের স্বপ্নে বিভোর হলেন। আওয়ামী লীগ বিলুপ্ত হলো, পুনর্জীবিত হলো, বিভ্রান্ত হলো, তলিয়ে যাবার উপক্রম হলো। বাংলাদেশ ও বাঙালির স্বপ্ন মিলিয়ে যাবার উপক্রম হলো। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা হোক, যতই জীবন সংহারের আশঙ্কা থাকুক তিনি দেশে ফিরে আসবেন। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে আকাশের কান্না ভেজা বাংলার মাটিতে এসে তিনি অবতরণ করলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে ফিরিয়ে আনবেন। দেশে ফিরে তিনি দলের সভানেত্রী হলেন, দুর্যোগ ও দুঃসময়ের সারথি হয়ে তিনি দলের বিগত ৪২ বছর যাবৎ সভাপতি ও রাষ্ট্রের চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী।

১৯৮৬ সালের নির্বাচনে তিনি সংসদে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হলেন ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর আসনে বসলেন। জনস্বার্থ বিবেচনা করে তিনি ১৯৮৮ সালে পদত্যাগ করেন। তারপর যুগপৎ আন্দোলন-সংগ্রাম। এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট গঠন করা হয় তিনি সেই জোটের প্রধান ছিলেন। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে তিনিই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

১৯৯০ সালের প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনে এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা, একাগ্রতা ও অনমনীয়তার কারণে সবাই ধরে নিয়েছিল ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনাই প্রধানমন্ত্রী হবেন। শতাংশের হারে বেশি ভোট পেয়েও তিনি বিএনপি অপেক্ষা কম সিট পেলেন। যে কারণে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর আকর্ষণীয় পদটি থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। জাতি বঞ্চিত হলো মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের নেতৃত্ব থেকে।

১৯৯১ সালে যুদ্ধাপরাধী দল জামায়েত ইসলামি তাদের যুদ্ধাপরাধী নাগরিক গোলাম আযমকে আমির বা সভাপতি হিসেবে ঘোষণা দিলে দুর্দম আন্দোলন শুরু হয়। ঘাতকবিরোধী আন্দোলন শুরু হলো আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে। এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল ঘাতক যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমসহ ১৯৭১-এর সকল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট রাজনীতি নিষিদ্ধ, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও ধর্মীয় স্থানগুলোতে রাজনীতি বন্ধ করা। আন্দোলনে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ শরিক সংগঠন হিসেবে যোগ দেয়। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণে আন্দোলনকারী শক্তি বিশেষত বুদ্ধিজীবীগণ অফুরন্ত অনুপ্রেরণা লাভ করে। শেখ হাসিনা না থাকলে জামায়াতের ন্যায় ক্যাডারভিত্তিক সশস্ত্র ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই কঠিন ছিল। ১৯৯২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শেখ হাসিনা প্রথম ঘাতকবিরোধী আন্দোলনের মঞ্চে বক্তব্য রাখেন। তাঁর নেতৃত্বে ১০১ জন সংসদ সদস্য গণ-আদালতে গোলাম আযমের বিচারের দাবি জানিয়ে তা স্পিকারের কাছে পেশ করেন।

ঘাতকবিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি সরকার পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরবর্তী কয়েকটি নির্বাচনের দাবি তুলে ধরে শেখ হাসিনা আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রহসনের নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রবল গণ-প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। শেখ হাসিনার জনতার মঞ্চই সরকার পতনকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচন ষড়যন্ত্রের কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বিএনপির রাষ্ট্রপতি ক্ষমতার অপব্যবহার করে ১২ জনের বেশি সেনা কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা করে। এবারে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মুক্তিযোদ্ধা জনতার মঞ্চ তৈরি হয়। একটানা ২২ দিন জনতার মঞ্চ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচারণায় অনুকূল জনমত সৃষ্টি এবং শেখ হাসিনার কৌশলী পদক্ষেপের কারণে ১২ই জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুরো সময়টা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাঁর সরকারকে আওয়ামী লীগ অপেক্ষা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের ঐকমত্যের সরকার মনে করতেন। তাঁর সরকারে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদ ও বিএনপির নির্বাচিত সদস্যরা মন্ত্রী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, তার নিদর্শন ও মূল্যবোধ সংরক্ষণে তিনি কতিপয় ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। অপ্রতুল হলেও ঐ সব ব্যবস্থায় আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার চেষ্টা অব্যাহত ছিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভোটাধিকার নিশ্চিত হবার পর শেখ হাসিনা জনগণের ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন। এই লক্ষ্য অর্জনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও নীতি প্রণীত হয়েছিল, একই সাথে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল। জনমঙ্গল নিশ্চিত করতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অংশ হিসেবে তিনি সংসদীয় কমিটিগুলো গঠিত ও পুনর্গঠিত করেন। এসব কমিটিতে মন্ত্রীর পরিবর্তে কোনো সাংসদকেই চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। তাঁর সরকার গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে ও

উন্নয়নের হাতিয়ার ও বাহন বানাতে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে গণপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলমান রেখেছে। দুস্থ মানুষের বিশেষত বয়স্কদের দুর্দশা খানিকটা লাঘবের জন্য হলেও তিনি বয়স্কভাতা প্রবর্তন করেছেন। নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে অত্যন্ত কঠোর ও সময়োপযোগী আইন প্রণীত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সন্ত্রাস দমনে তাঁর সরকারের সফলতা একেবারে কম নয়।

তবে তাঁর প্রথমবারের সরকারের বিশাল অর্জন হচ্ছে ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি চুক্তি সম্পাদন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ও ইনডেমনিটি বিল রদ করে বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের বিচার পর্বের সূচনা। এগুলো ছিল অনেক পুরানো সমস্যা। পানি সমস্যা পাকিস্তান আমলের আর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা প্রায় ২৪ বছরের পুরানো ছিল। আত্মঘাতী ও ভ্রাতৃঘাতী পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা প্রচুর রক্ত ঝরিয়েছে; স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছিল এবং বহির্বিশ্বে মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক বাঙালির ভাবমূর্তিকে চুরমার করে উন্নয়ন ও অগ্রগতির সংকট সৃষ্টি করেছিল। শেখ হাসিনা তাঁর কৌশলী নেতৃত্বে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে এই অঞ্চলকে দেশের মূল স্রোতের সাথে সম্পৃক্তকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন। গঙ্গার পানি চুক্তি ও পার্বত্য শান্তিচুক্তির ফলে উন্নয়নের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্তসহ প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্কের ভিত্তি রচিত হয়েছে। তাঁর সরকারের এসব ইতিবাচক পদক্ষেপের স্বীকৃতি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও মিলেছে। বিশ্বের একাধিক শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শেখ হাসিনা সম্মানসূচক ডিগ্রি পেয়েছেন। তাঁর আপন বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার সিনেট তাঁকে একটি সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করেছে। আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু কাঙ্ক্ষিত শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উপ-মহাদেশের পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তাররোধের প্রচেষ্টায় দেশে-বিদেশে তিনি আলোচিত হয়েছেন। শান্তি প্রচেষ্টায় তাঁর অবদান অনন্য বলেই নোবেল পুরস্কার তিনি পাবেন বলে প্রত্যাশা ছিল। তাঁরই মডেলে আয়ারল্যান্ডে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করায় দুই আইরিশ নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। তাই সব মিলিয়ে তাঁর অর্জনকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তাঁর আমলের অপর একটি বিশাল অর্জন হচ্ছে বিশ্বের ১১তম দীর্ঘতম সেতু বঙ্গবন্ধু সেতুর উদ্বোধন। ১৯৯৮ সালের ২৩শে জুন তাঁর প্রথম শাসনামলের দু'বছর পূর্তির দিনে এটা উদ্বোধন করা হয়। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে সেতুটির কাজ শুরু হলেও মাত্র দু'বছরে এই সেতুর তিন-চতুর্থাংশ কাজ সমাপ্ত করে তিনি রেকর্ড সৃষ্টি করেন। সম্প্রীতি, সম্পৃক্তি ও উন্নয়নের দুয়ার এই সেতু খুলে দিয়েছে বলে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

তাঁর আমলের অপর একটি অবিস্মরণীয় অর্জন হচ্ছে কুখ্যাত ইনডেমনিটি আইন বাতিল, যা বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচারের পথ সুগম করেছে। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ঘাতকদের বিচার না করে প্রচলিত আদালতই বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার করেছে। তাঁর সরকারের ম্যাক্রো ইকোনমিক ব্যবস্থাপনা বিশেষ প্রশংসিত হয়েছে। সে কারণে অতীতে যেসব ঋণ সুবিধা আন্তর্জাতিক সংস্থা বন্ধ করেছিল, তা আবারও মঞ্জুর করা হয়েছে। তাঁর আমলে মাইক্রো ইকোনমিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা কাটিয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতির সুফল লুফে নিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। দেশে ঋণখেলাপি সংস্কৃতি প্রতিহত করতে উঠতি বুর্জোয়াদের বিরাগভাজন অনেক পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছিল। সে আমলে প্রতিষ্ঠিত দেউলিয়া আদালত তন্মধ্যে অন্যতম। যে তারল্য সংকটের ধুয়া তুলে সমগ্র অর্থনীতিকে অস্থির ও ভয়াবহ করা হয়েছিল তা নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। তাঁর প্রথম

শাসনামলে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি কিংবা বেতন বৃদ্ধির কারণে দ্রব্যমূল্য কিছুটা বেড়েছিল, কিন্তু সুষ্ঠু ম্যাক্রো ইকোনমিক ব্যবস্থাপনার কারণে বাংলাদেশের ভাগ্য সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়াসহ পূর্ব এশিয়ার উদীয়মান ব্যাঘ্রদের মতো হয়নি।

শেখ হাসিনার প্রথমামলের কতিপয় পদক্ষেপ জাতির জন্যে মঙ্গলজনক হলেও দলীয় রাজনীতিকে অসন্তুষ্ট করেছিল। এগুলোর মধ্যে আছে নির্মোহভাবে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার, মেডিকেল কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষা বিলোপ, টেন্ডার গ্রহণে লটারির ব্যবস্থা প্রবর্তন। তাঁর আমলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে তাঁর সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের যত নেতাকর্মী গ্রেপ্তার হয়েছিল পূর্ববর্তী ২১ বছরেও ততসংখ্যক সন্ত্রাসী কোনো সরকার গ্রেপ্তার করেনি। মেডিকেল কলেজের ভর্তিতে মৌখিক পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় অন্যায্য পথে ভর্তির পথ বন্ধ হয়েছে। টেন্ডারবাজি থেকে উদ্ভূত সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে লটারির মাধ্যমে উচ্চ ও নিম্ন দরদাতা নির্ধারণে সন্ত্রাসের প্রকোপ কমেছে। এসব ব্যবস্থা তেমন প্রশংসিত হয়েছে বলে শুনিনি। স্বপক্ষীয়রা অনেকে এসবের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জনমঙ্গলে তিনি এসব বলবৎ রেখেছিলেন।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘের ঘোষণা আদায়ও শেখ হাসিনার অনন্য কৃতিত্ব। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ঘোষণার জন্য তার প্রয়াসও সফলতা অর্জন করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পূর্ববর্তী সরকার আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্মৃতিসৌধের কাজ তাঁর সময়ে সমাপ্ত হয়েছে।

তাঁর শাসনামলে মুক্তিযোদ্ধাদের যেভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে তা পূর্বে কখনও হয়নি। দুস্থ মানুষের মাথাগোঁজার ঠাঁই করে দিতে তাঁর সরকার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও বহু নির্মাণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। একটি বাড়ি, একটি খামার এক অনন্য কর্মসূচি। বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক তাদের লেনদেন কাজ শুরু করেছে। বন্যা ও বন্যা-পরবর্তী পুনর্বাসন কর্ম অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে সম্পন্ন করে শেখ হাসিনা দেশি ও বিদেশিদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রথম শাসনামলে যেখানে বিদেশি পত্রিকার পূর্বাভাস ছিল যে আকস্মিক বন্যায় দু'কোটি মানুষ মারা যাবে, সেখানে মালের ক্ষতি মাত্রাতিরিক্ত হলেও মানুষ মরেছে ২ হাজারেরও অনেক কম, তাও কজন না খেয়ে মরেছে সে তথ্য বিরোধী পক্ষও উপস্থাপন করতে পারেনি।

তাঁর সরকার ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছিল। সেই কবে ম্যালথাস নামক একজন ধর্মযাজক বলেছিলেন যে, 'জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে আর খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে'। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, আবাদি জমির ক্রমহ্রাস কিংবা উৎপাদিকা হ্রাসের কারণে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ছিল অকল্পনীয়। আশ্চর্য হলেও সত্যি তাঁর আমলে বাংলাদেশ শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নয়, খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অথচ ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা যখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন খাদ্য ঘাটতি ছিল ৪০ লক্ষ টন। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দুটো বন্যা হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যে উদ্বৃত্ত অর্জন ম্যালথাসের তত্ত্বকে নিঃসন্দেহে মিথ্যা প্রমাণ করেছে।

আন্দোলন সংগ্রামে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকলেও প্রথমামলে তাঁর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছিল নগণ্য। তাঁর ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। অনেক মন্ত্রীই ছিলেন তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ। একটি শক্তিশালী অথচ আক্রমণাত্মক বিরোধী দল ছিল। ছিল একটি গণবিরোধী অদক্ষ আমলাতন্ত্র। সুকৌশলে সমাজের প্রতিপক্ষ শক্তিকে জাগিয়ে তোলার ষড়যন্ত্র ছিল। ২০০১ সালে শেখ হাসিনা সফলভাবে তাঁর মেয়াদ সমাপ্ত করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান লতিফুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তিনি তাঁর সাফল্যের ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত ছিলেন যে নির্বাচনে কোনো কৌশলী ভূমিকাও নেননি। লতিফুর রহমান ও তাঁর মিত্রদের কূটকৌশলে ও নগ্ন পক্ষপাতিত্বের কারণে এতসব বিশাল অর্জনের পরও নির্বাচনে তাঁর দলের পরাজয় ঘটে।

আবারও বাংলাদেশই শুধু সংকটে নয় শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত জীবনও অপরিমেয় সংকটে নিপতিত হয়। তাঁকে মেরে ফেলার প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামী মানুষটি নিজেই বার বার সন্ত্রাসীদের কুনজরে পড়তে থাকেন। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় আল্লাহ মাবুদ তাঁকে মহৎ কিছু করার জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। পূর্বের সরকার ও পরবর্তীর সেনা-সমর্থিত তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে তাঁর দুর্গতি, দুর্দশা ও বঞ্চনা জাতীয় বঞ্চনাকে ছাড়িয়ে যায়। শত প্রতিকূলতার মাঝে তিনি ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনেন।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ২০০৯ সালে সরকার গঠন করেন। তাঁর মন্ত্রিসভায় অপেক্ষাকৃত তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়কে আংশিক হলেও কার্যকরী করতে সক্ষম হন। ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক মাস পরেই একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেন। এ দুটো ব্যথাভার জাতি দীর্ঘদিন বহন করছিল। একটির আপাতত সুরাহা হয়েছে, অপরটি চলমান রয়েছে এবং এ যাবৎ উল্লেখযোগ্য সফলতা নিশ্চিত করেছে। তাঁর দুঃসাহসিক ও দেশপ্রেমিক পদক্ষেপে শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীদের অনেকেই শাস্তি পেয়েছে। বিচার কাজ থেমে নেই। জাতির প্রত্যাশা মোতাবেক শেখ হাসিনা বিশেষ আদালতে নিষ্পত্তি না করে প্রচলিত আদালতের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারকার্য শেষ করে দূরদর্শিতা নয়, রাষ্ট্রনায়ক সুলভ আচরণের প্রমাণ আরও একবার রাখলেন।

প্রথম শাসনামলে তাঁর গৃহীত আরও কতিপয় বিষয়ের চূড়ান্ত সমাধান দিয়েছেন, তন্মধ্যে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্জন, কমিউনিটি হাসপাতালগুলো পুনঃচালুকরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা বলয় প্রসারের পদক্ষেপগুলো রয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতি এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ দেখল। বিরোধী দল ও বিপক্ষের যৎসামান্য বাধার মুখে যে শিক্ষানীতি কার্যকর হচ্ছে তা জাতিকে বহুদূর এগিয়ে নেবে।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করি। তারপর শেখ হাসিনার কৌশলী ও দূরদর্শী

নেতৃত্বের ফলে সাগর গর্ভের ১১১৬০০ বর্গকিলোমিটার জায়গার ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই বিশাল অর্জনের সূচনা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর হাতে আর সমাপ্তি ঘটেছে শেখ হাসিনার হাতে। ছিয়াত্তর বছরের প্রায় তামাদি ছিটমহল সমস্যার তিনি সম্মানজনক সমাধান এনে দিয়েছেন।

শেখ হাসিনা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বাংলাদেশ, দুর্নীতিমুক্ত ও দক্ষ বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে বিদ্যমান সম্পদের সুব্যবহার দিয়ে বাংলাদেশকে তাঁর সুবর্ণ জয়ন্তীতে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার টার্গেট দিয়েছিলেন। সমুদ্রগর্ভে বিশাল সম্পদের সুব্যবহার করা গেলে এক সময়ে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের নয়, উচ্চআয়ের দেশে পরিণত হবে। বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন আর শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছেন।

শত্রু ও সুশীলদের মুখে ছাই দিয়ে তিনি আবারও ২০১৪ সালে নির্বাচনে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তিও তাঁকে ছাড়া দ্বিতীয় কিছু ভাবতে পারছে না। কেননা, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় না থাকলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, ধ্বংসাত্মক অস্ত্র মামলা ও গ্রেনেড হামলার রহস্য উদ্‌ঘাটন, জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার কিংবা দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরা সম্ভব ছিল না। আশা করছি, রাষ্ট্রনায়কের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে তিনি আমাদের ইতিহাসে অব্যয় ও তেজোদীপ্ত হয়ে থাকবেন আর জাতি দারিদ্র্যের অভিশাপ ক্রমশ মুক্ত হবে। তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসেও তিনি কেবলই উন্নয়নের ইট গেঁথে যাচ্ছেন, প্রতিদিন নতুন ইতিহাস গড়ছেন, আজ ও কালের মধ্যে দৃশ্যমান ব্যবধান সৃষ্টি করছেন। সে কারণে ২০১৮ সালে জনগণ আবারও তাঁকেই ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছে। এই সময়ে পদ্মা সেতুর মতো মেগা প্রকল্প স্বঅর্থে বাস্তবায়ন হয়েছে। আরও বহু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে কিংবা জাতীয় উন্নয়ন বঙ্গবন্ধুর আমলকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। কোভিডের ঢেউ না লাগলে বা ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে বেসামাল পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে মাথাপিছু আয় তিন হাজার ছাড়িয়ে যেত। উন্নয়নশীল দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ নিশ্চিত হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চআয়ের দেশ হওয়াটা ঠিক সময়ের ব্যাপার।

এই সময়ের মধ্যে তিনি রাজনীতিবিদ থেকে রাষ্ট্রনায়কে উত্তীর্ণ হয়েছেন। দেশের এমন কোনো জায়গা নেই তিনি হাত দেননি এবং সফল হননি। তিনি হয়েছেন রোল মডেল, বাংলাদেশ হয়েছে বিশ্বের ৩৫তম অর্থনীতির দেশ; শত দুর্ভোগ ও দুর্যোগের মাঝেও তিনি রয়েছেন অগ্রগামী। মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও বাবার স্বপ্নই তাঁর পাথেয়। কোনো কিছুতেই তিনি বাবার আদর্শকে বিসর্জন দেননি। বাবার অনুরাগী ও অনুসারী যোগ্য কন্যাটি বিশালাংশ বাঙালিদের জন্যে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করেছেন। দেশে নয় বিদেশেও তিনি সমাদৃত। বাঙালির মুখোজ্জ্বল করেছেন, পিতার বিদেহী আত্মার আশীর্বাদ ও আকাঙ্ক্ষার জোরে তাঁর সব অর্জন বর্ণনা হবে এক মহাকাব্য। প্রতিদিন তিনি সংযোগ করে যাচ্ছেন একাধিক মহাকাব্যের উপকরণ। কদিন আগে তিনি সর্বজনীন পেনশন স্কিমের প্রবর্তন করেছেন। তাঁর জীবনদর্শন ও সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসার স্মারক এই স্কিম। যে যা বলুক, এ এক যুগান্তকারী ঘোষণা ও ঘটনা, বাংলার মানুষকে তিনি গ্রহীতার অবস্থান থেকে দাতার অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। এই স্কিমের সফল পরিণতিতে মানুষ পড়ন্ত বিকেলে একটু সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে আর দু'হাত তুলে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যার জন্যে দোয়া করবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে এগুচ্ছেন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে পদার্পণ করছেন, তাতে দেশ বর্তমান ৩৫তম অর্থনীতি থেকে ২৫তম অর্থনীতিতে অচিরেই পদার্পণ করবে। বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি আর অবিবেচক ও অনৈতিক ব্যবসায়ীদের কর্মকাণ্ড তাঁকে বিব্রত অবস্থায় ফেলেছে। তারপরও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেমে নেই। একদিনে ১০০ সেতুর উদ্বোধন অকল্পনীয় ব্যাপার। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, চিকিৎসা ও শিক্ষাবিহীন মানুষের সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রে শূন্যে নেমেছে। এর নাম নিরন্তর এগিয়ে চলা। মনে হচ্ছে কৃতজ্ঞ জাতি তাঁকে পঞ্চমবারের মতো নির্বাচিত করবেই। তাই স্বগৃহে ও বহিরাঙ্গনের শত্রুদের ব্যাপারে সতর্ক ও মাপার পদক্ষেপ নিতে হবে।

২৮শে সেপ্টেম্বর তাঁর ৭৭তম জন্মদিন। নেত্রী হাসিনা, রাজনৈতিক হাসিনা, রাষ্ট্রনায়ক হাসিনা, বিশ্বনেত্রী হাসিনা ও মানুষ হাসিনা শতায়ু হোক, এই আমাদের কামনা।

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী: বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও উপাচার্য ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার নতুন নিয়ম

বিধিমালা সংশোধন করে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম এনেছে বাংলাদেশ সরকার। ৯ই আগস্ট ২০২৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। নতুন নিয়মে পতাকা অর্ধনমিত রাখার ক্ষেত্রে পতাকা দণ্ডের ওপর থেকে চার ভাগের একভাগ দৈর্ঘ্যের সমান নীচে উড়াতে হবে। বিধিমালায় আগে এটি নির্ধারণ করে দেওয়া ছিল না।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয় সংগীত, পতাকা এবং প্রতীক অধ্যাদেশ, ১৯৭২-এর আর্টিকেল-৫ এ দেওয়া ক্ষমতাবলে সরকার পতাকা বিধিমালা সংশোধন করেছে। সংশোধিত বিধিমালায় বলা হয়, পতাকা অর্ধনমিত রাখার ক্ষেত্রে পতাকা প্রথমে পতাকা দণ্ডের সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত উত্তোলন করতে হবে। এরপর পতাকা দণ্ডের এক-চতুর্থাংশের দৈর্ঘ্যের সমান নীচে নামিয়ে পতাকাটি স্থাপন করতে হবে। পতাকা নামানোর সময় ফের পতাকা দণ্ডের সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত তুলে এরপর নামাতে হবে।

সাধারণত ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসসহ জাতীয়ভাবে শোক পালনের দিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

প্রতিবেদন: শুভজিৎ সাধক

‘সেপ্টেম্বর’ হোক শেখ হাসিনাকে মূল্যায়নের বিশেষ মাস

ড. মিল্টন বিশ্বাস

২৮শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন। এই সেপ্টেম্বর মাসটি হোক তাঁর শাসনকালের নিবিড় মূল্যায়নের মাস। সারা বছরই বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি দেশ-বিদেশে আলোচিত হচ্ছেন কিন্তু তাঁর জন্ম মাসটিকে আমরা বিশেষ তাৎপর্যে অভিষিক্ত করতে চাই। সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের ‘মহান শিক্ষা দিবস’ পালিত হয়, যার সঙ্গে শেখ হাসিনার সম্পর্ক আছে; আছে ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস’; যা তাঁর সরকারের মূল্যবান অর্জন হিসেবে গণ্য। আরও আছে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী প্রীতিলতার আত্মাহুতি দিবস, যিনি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আত্মাহুতি দেন এ মাসেই। সব মিলে ত্যাগে, অর্জনে ও সাফল্যে একটি মহিমান্বিত মাস হলো ‘সেপ্টেম্বর’। ‘সেপ্টেম্বর’ বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মাস। কারণ ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি অর্থাৎ ২০ বছর চলমান শেখ হাসিনার শাসনকাল। এ মাসে তিনি না জন্মালে আমরা থাকতাম অন্ধকারে; সুশাসন পেতাম না। তাঁর জন্ম মাস এজন্য আমাদের কাছে কল্যাণকর ও মঙ্গলময়। তবে বাকি আছে তাঁর শাসনকালের ভবিষ্যতের দিনগুলো। এখন প্রয়োজন ‘শেখ হাসিনা শাসনকালে’র বিশ্লেষণ। দেখা দরকার এ দেশের অগ্রগতিতে এই শাসনকাল কতটা ভূমিকা রেখেছে। বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে তাঁর নেতৃত্ব কতটা কার্যকর হয়েছে; সুবাতাস বয়ে এনেছে এ দেশের জনগণের অন্তরে।

গত ২০ বছরে জননেত্রী শেখ হাসিনা কেন জনগণের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন? এ প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে দু’একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যায়। প্রথমত শেখ হাসিনা ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিসম্পৃক্ত। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাঁর সহপাঠীরা স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, হাসিনার ছিল একটা আকর্ষণীয় ক্ষমতা, সবার সঙ্গে খুব সহজেই মিশতে পারতেন। একেবারে সহজ-সরল আন্তরিকতায় ভরা মন। সবার মন জয় করার একটা মুগ্ধময় ক্ষমতা ছিল তাঁর। বেবী মওদুদ লিখেছেন, ‘তাঁর সঙ্গে আমার মনের মিল ছিল যথেষ্ট। বিশেষ করে বই পড়া, গান শোনা, আড্ডা, সভায়-মিছিলে যাওয়া এবং ছাত্র রাজনীতির কাজকর্ম করা। যদিও দুজনে দুই সংগঠনে তারপরও আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁর কথাবার্তা, চিন্তাভাবনার সঙ্গেও তখন থেকে আমি সহমর্মী হই। তাঁর জনদরদি মন আছে যা আমাকে স্পর্শ করে থাকে। তাঁর প্রথম পছন্দ বই পড়া। বই উপহার পেলে তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হয়ে থাকেন। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক নেতা এবং অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।’

পিতার রাজনৈতিক আদর্শ, আন্দোলন-সংগ্রাম-কারাবন্দি জীবন সবই তিনি শৈশব-কৈশোর থেকেই দেখেছেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে পিতার আদর্শ উত্তরাধিকারী হিসেবে গড়ে তোলে। তিনি যখন আজিমপুর গার্লস স্কুলে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, তখন নেতৃত্ব দিয়ে ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলার বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেন। এ সময় পুলিশ তাঁদের

ওপর লাঠিচার্জ করেছিল। এরপর ঢাকার উচ্চমাধ্যমিক মহিলা কলেজের ছাত্রী সংসদ নির্বাচনে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়ে কলেজের ছাত্রীদের সমস্যা সমাধান ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন। কলেজে শহিদমিনার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের কথা লেখা আছে শেখ হাসিনার নিজের রচনায়। 'আমাদের দেশে ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্য ছিল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আন্দোলন করার জন্য। ছাত্র রাজনীতির এই ঐতিহ্য নষ্ট করার জন্য এবং আইয়ুব খানের আমলেই ছাত্র রাজনীতিতে অস্ত্রধারীদের মহড়া শুরু হয়। মেধাবী গরিব ছাত্রদের অর্থ দিয়ে ছাত্র রাজনীতি ধ্বংসের এই চক্রান্ত আজও বিদ্যমান।' (স্কুল জীবনের কিছু স্মৃতিকথা, সাদা কালো)। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর পিতার রাজনৈতিক জীবনকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়েছিল বলেই তিনি বঙ্গবন্ধুর মতো বাংলার মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। দ্বিতীয়ত ১৯৮১ সালের ১৭ই মে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে তিনি বলেছেন– 'আমার একমাত্র দায়িত্ব পিতার অধরা স্বপ্ন সফল করা।' শেখ হাসিনা প্রায়শ বলে থাকেন, 'জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই আমার রাজনীতি।' শিশুদের মধ্যে ভবিষ্যৎ দেখতে ভালোবাসেন, 'শিশুরা আমাদের দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করে তাদের ভবিষ্যতকে আনন্দ, উজ্জ্বল, স্বস্তি ও শান্তিময় করে তুলতে হবে।' তিনি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন ও সংগ্রাম, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সাহসী যোদ্ধা, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার প্রবক্তা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে তাঁকে বিশেষভাবে শান্তি পুরস্কার ও সম্মানীয় ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হয়। তাঁর শাসনকালে দেখা গেছে যে, কোনো সংকট মুহূর্তে কিংবা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনা ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৮২ থেকে আজ পর্যন্ত অনেকগুলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তিনি প্রচণ্ড দৃঢ়তার সঙ্গে নিয়েছেন। প্রতিকূল পরিবেশ, সহকর্মীদের শত বাধা এবং সুশীলসমাজ কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণরূপে তাঁর বিপক্ষে থাকার পরও তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে এবং পরবর্তীতে আবার সংসদ থেকে বের হয়ে আসা একটি বিশাল ব্যাপার ছিল। ১৯৯১ সালের পর বিএনপিবিরোধী আন্দোলনে সফলতা, ১৯৯৬ সালের সরকার প্রধান হিসেবে সাফল্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; তেমনি ১/১১'র প্রেক্ষাপটে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনন্য সাধারণ। সব শেষে ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির নির্বাচনটি তিনি করেছিলেন দূরদর্শী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে– বিরোধীপক্ষসহ তাবৎ দুনিয়ার ক্ষমতাবান রাষ্ট্রশক্তির হুমকি-ধামকি উপেক্ষা করে কেবলমাত্র নিজের দলের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে। এজন্য তাঁর উপলব্ধি তাৎপর্যবহ– 'বাংলাদেশের জনগণের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাদের ভালোবাসার প্রতিদান আমাকে দিতেই হবে। জনগণের জন্য একটা সুন্দর, উন্নত জীবন উপহার দেব, এই আমার প্রতিজ্ঞা।' (সবুজ মাঠ পেরিয়ে, *সবুজ মাঠ পেরিয়ে*)

২০১৮ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার গঠিত হওয়ার পর দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এসেছে। এমনকি হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা-অত্যাচার নির্মূল করা হয়েছে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে স্বস্তি ফিরে এসেছে। বিদেশি রাষ্ট্রের ক্রমাগত অভিনন্দনে মুখরিত এখন বাংলাদেশের প্রতিটি আঙিনা; অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বিস্ময়করভাবে আমরা লক্ষ করলাম যেসব ব্যক্তি নির্বাচনোত্তর সমালোচনায় মুখর ছিলেন তারা এখন সরকারের গুণগানে আলোড়িত; টিভির টকশোতে তারা বর্তমান সরকারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কৃতিত্বে আনন্দিত। তবু অপপ্রচার থেমে নেই। দেশ-বিদেশে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিচিত্র অপপ্রচার বাংলাদেশের জনগণকে বিভ্রান্তিতে ফেললেও আওয়ামী লীগের ওপর আস্থা পুনর্বহাল হতে দেখা গেছে বার বার।

দেশ ও জাতির কল্যাণের স্বার্থে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যাতে আমাদের তরুণ প্রজন্ম একটি সুন্দর সমাজ পায়; দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ সকলে মিলে গড়ে তুলতে পারি। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিববর্ষের পরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে সকল ভেদাভেদ ভুলে এখন গড়ে তুলি ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশ, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা– এই প্রত্যাশা শেখ হাসিনার সবসময়ের জন্য। আর এজন্যই 'সেপ্টেম্বর' মাস হোক তাঁর শাসনকাল মূল্যায়নের স্বতন্ত্র ও গুরুত্ববহ একটি মাস।

ড. মিল্টন বিশ্বাস: বঙ্গবন্ধু গবেষক এবং বিশিষ্ট লেখক, কবি, কলামিস্ট, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম এবং অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, drmiltonbiswas1971@gmail.com

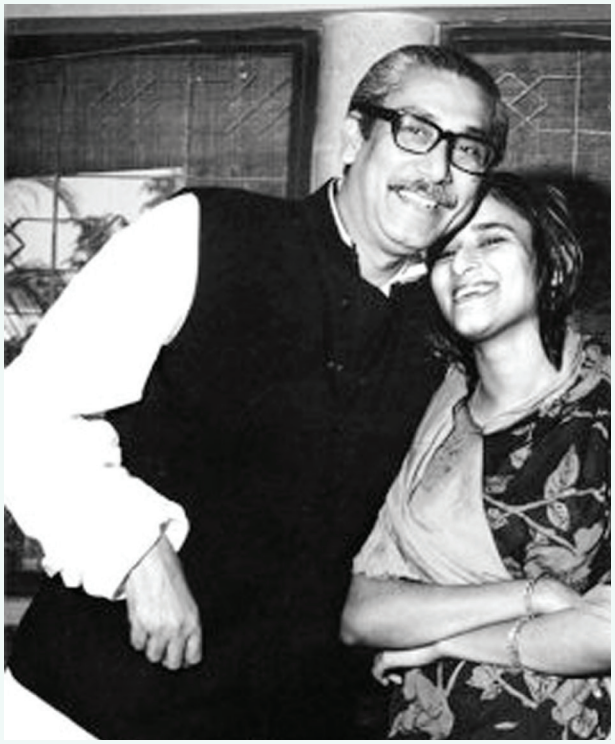

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় শেখ হাসিনার অবিচল যাত্রা

প্রফেসর ড. প্রণব কুমার পান্ডে

প্রতিবছর ২৮শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের জনগণ শুধুমাত্র একজন অসাধারণ নেতার জন্মদিনই উদ্‌যাপন করতে একত্রিত হয় না, বরং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য উত্তরাধিকারের মূর্ত প্রতীকের জন্মদিন উদ্‌যাপন করে, যিনি বাংলাদেশের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন। জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা শুধু তাঁর পিতার উত্তরাধিকারই এগিয়ে নেননি, দেশের উন্নয়নে এক রূপান্তরকামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে ইতিহাসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে গভীর অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করা একটি পরিবারে জন্ম নেওয়া শেখ হাসিনার শৈশব আবর্তিত হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে। তিনি বাঙালির অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় তাঁর বাবার নিরলস প্রচেষ্টার সাক্ষী হয়ে বড়ো হয়েছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁর পরিবারের সাথে যে ট্র্যাজেডি ঘটেছিল, যখন তাঁর বাবা এবং পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যকে হত্যা করা হয়েছিল, তা তাঁর জীবনের মোড়কে পরিবর্তিত করেছিল। ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির মুখে দাঁড়িয়েও শেখ হাসিনা দমে যাননি, বরং একটি গণতান্ত্রিক, ন্যায়পরায়ণ এবং প্রগতিশীল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাঁর পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি অটল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছেন।

১৯৮১ সালের ১৭ই মে নির্বাসন থেকে শেখ হাসিনার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন জাতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। তাঁর পিতার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর বছরের পর বছর নির্বাসনে কাটিয়ে তিনি দেশে ফিরে ভঙ্গুর আওয়ামী লীগের জন্য আশার আলো হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মাতৃভূমির মাটিতে পা রেখে, একদিকে যেমন তিনি তাঁর পরিবারের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন, ঠিক তেমনিভাবে জাতির আকাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জনে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাঁর পিতার অসমাপ্ত কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং দলকে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের প্রতি তাঁর অটল প্রতিশ্রুতি ফুটে উঠেছে। সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে তিনি শুধু দলকে পুনরুজ্জীবিতই করেননি, বরং নতুন প্রজন্মের নেতাদেরও উজ্জীবিত করেছেন, আওয়ামী লীগকে তার ভিত্তি পুনর্গঠন করতে এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

১৯৮১ সালে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর শেখ হাসিনা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কর্তৃত্ববাদী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অবস্থানের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের নীতিকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অটল অঙ্গীকার ফুটে উঠেছিল। বিভিন্ন ধরনের হুমকি এবং চ্যালেঞ্জকে উপেক্ষা করে তিনি নির্ভয়ে সকল প্রকার প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, জনগণের সমর্থন আদায় করেছিলেন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর অটল দৃঢ়তা এবং অধ্যাবসায়ের ফলে অবশেষে সামরিক শাসনের পতন নিশ্চিত হয় এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যাকে গণতান্ত্রিক শাসন ও মানবাধিকারের আদর্শের বিজয় হিসেবে পরিগণনা করা হয়।

নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিবেচনা করে তিনি যদি ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে এসে ভঙ্গুর আওয়ামী লীগের হাল না ধরতেন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ব্রতী না হতেন, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতে পারত। বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানি আমলের মতো সামরিক সরকারের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতো আরও অনেক বছর ধরে। দেশের স্বাধীনতা এনে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ দিনে দিনে আরও দুর্বল হয়ে যেত। তিনি তাঁর পিতার আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা না ভেবে জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে সামরিক সরকারের সকল বাধাকে উপেক্ষা করে সেদিন দেশে ফিরে এসেছিলেন। আওয়ামী লীগকে দুর্বল করবার সামরিক সরকারের সকল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁরই যোগ্য নেতৃত্বে দলটি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

তাঁর পক্ষে জাতির পিতার উত্তরাধিকার বহন করে এগিয়ে যাওয়া মোটেই সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু শেখ হাসিনা অসাধারণ দৃঢ়তার সাথে তা করে দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর পিতার সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে রাজনীতির সকল প্রকার জটিলতাকে পাশ কাটিয়ে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় তাঁর সক্ষমতা বিস্ময়কর ছিল।

বঙ্গবন্ধুর সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে সব সময় কাজ করে গেছে। ১৯৭১ সালে সংগঠিত যুদ্ধাপরাধের বিচার নিশ্চিত করার তাঁর প্রচেষ্টা এবং জাতির ইতিহাস সংরক্ষণে তাঁর উৎসর্গ পিতার উত্তরাধিকারকে সম্মান করার জন্য তাঁর অদম্য সংকল্পের প্রতীক।

বাংলাদেশের উন্নয়নের দৃশ্যপটে শেখ হাসিনার প্রভাব স্মরণীয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় থেকে তিনি দেশকে একটি সংগ্রামী জাতি থেকে অগ্রগতি এবং সহনশীলতার বিশ্বব্যাপী উদাহরণে রূপান্তর করেছেন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে অন্তর্ভুক্ত করে দেশের উন্নয়নের জন্য তিনি একটি সামগ্রিক পদ্ধতির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

তাঁর নেতৃত্বে দেশ ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং টেক্সটাইল, কৃষি এবং উৎপাদনের মতো খাতসমূহে সমৃদ্ধ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনা এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সূচকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধনে বাংলাদেশের অর্জনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে।

শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃতে বাংলাদেশ অবকাঠামোগত উন্নয়নের একটি অসাধারণ যুগের সাক্ষী হয়েছে, যার রূপান্তরমূলক প্রকল্পগুলো দেশের ভূ-প্রকৃতিকে নতুন আকার দিয়েছে। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল এবং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেলের মতো স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করার কার্যক্রমের সমাপ্তি দেশের অবকাঠামো আধুনিকীকরণে তাঁর অটল অঙ্গীকারের প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন হিসেবে বিবেচিত এই প্রকল্পগুলো দেশের অগ্রগতি, সংযোগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাস্তব প্রতীক হয়ে উঠেছে। শেখ হাসিনার সরকার কৌশলগত অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করার দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শন করার মাধ্যমে শুধু পরিবহণ নেটওয়ার্কেরই উন্নয়ন হয়নি, বরং বাণিজ্য, শিল্প এবং সামগ্রিক উন্নয়নকেও সহজতর করেছে। এই স্বপ্নদর্শী প্রকল্পগুলোকে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশগত টেকসই-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে চলেছে গত ১৫ বছর। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির মতো উদ্যোগের লক্ষ্য হলো সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ভেঙে লিঙ্গ সমতাকে নিশ্চিত করা। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তাঁর ভূমিকা বৈশ্বিক স্বীকৃতি পেয়েছে কারণ তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশকে রক্ষার টেকসই অনুশীলনের পক্ষে কথা বলেছেন সব সময়।

বাংলাদেশে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে শেখ হাসিনার ভূমিকা তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের প্রতি তাঁর অটল অঙ্গীকারের প্রমাণ। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ধারাবাহিকভাবে এমন নীতি ও উদ্যোগ নিয়েছেন যেগুলোর লক্ষ্য আর্থসামাজিক বৈষম্য দূর করা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করা। দারিদ্র্য হ্রাস করা, স্বাস্থ্যসেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার (এক্সেস) নিশ্চিত করা এবং সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতের ওপর তাঁর সরকারের দৃষ্টি অসংখ্য নাগরিকের জীবনকে বাস্তবিক অর্থে উন্নতির দিকে পরিচালিত করা। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি) এবং বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুবিধা সমাজের সকল স্তরের জনগণের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা নিশ্চিত করেছেন। উপরন্তু, নারীর ক্ষমতায়ন ও বৈষম্যবিরোধী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি তাঁকে বৈশ্বিক নেতার স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।

শ্রদ্ধেয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য শেখ হাসিনার অটল সংকল্প তাঁর নেতৃত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মীয় সহনশীলতা এবং অন্তর্ভুক্তির আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে তিনি ধারাবাহিকভাবে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে চলেছেন যেখানে সকল ধর্মের মানুষ সহাবস্থান করতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত ধর্মনিরপেক্ষ নীতিগুলোকে সমুন্নত রাখার প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি তাঁর নীতি ও কর্মে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিষয়গুলো থেকে ধর্মকে আলাদা করতে সহায়তা করেছে। চরমপন্থার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার দৃঢ় অবস্থান এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপ উন্নীত করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা এমন একটি জাতি গড়ে তোলার প্রতি তাঁর উৎসর্গের ওপর জোর দেয় যেখানে বৈচিত্র্য উদ্‌যাপন করা হয় এবং নাগরিকরা বৈষম্যের ভয় ছাড়াই তাদের বিশ্বাস অনুশীলন করতে পারে।

কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তা, শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি এবং গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ইস্যুতে সক্রিয় অংশগ্রহণের সক্ষমতার জন্য আঞ্চলিক রাজনীতিতে শেখ হাসিনার অবদান প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি আঞ্চলিক সম্পর্ক জোরদার করতে, অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিতে এবং বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর 'প্রতিবেশী প্রথম' দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নত করতে এবং স্থিতিশীলতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে আঞ্চলিক সমস্যা সমাধান করতে সহায়তা করেছে। তিনি সার্ক এবং বিমসটেকের মতো ফোরামের মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতা নিশ্চিতের পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন, বাণিজ্য এবং সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের মতো সমস্যাগুলো মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন। আঞ্চলিক রাজনীতিতে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে– যা এই অঞ্চলের সম্মিলিত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

শেখ হাসিনার জন্মদিনে জাতি তাঁর জীবনের মূল আদর্শকে উদ্‌যাপন করে যার মূল ভিত্তি হচ্ছে সহনশীলতা, ত্যাগ এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যাত্রা। তাঁর পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি এমন একটি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যার মধ্যে তাঁর পিতার আদর্শ অনুরণিত হয়। ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতি তাঁকে শুধু বাংলাদেশের নেতাই নয়, বরং বিশ্বের নেতাদের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

শেখ হাসিনার কাজের মাধ্যমে আমরা পিতার প্রতি কন্যার ভালোবাসা, জাতির প্রতি একজন নেতার উৎসর্গ এবং দেশের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য একজন স্বপ্নদর্শীর প্রতিশ্রুতির সারমর্ম খুঁজে পাই। জাতি যেমন শেখ হাসিনাকে তাঁর জন্মদিনে সম্মান জানায়, তেমনি তাঁর উত্তরাধিকারকেও সম্মান জানায়– যা তিনি নির্মাণ করে চলেছেন এটা নিশ্চিত করে যে, অতীতের ত্যাগ আগামী দিনের প্রতিশ্রুতিতে রূপান্তরিত হবে। বাংলাদেশের জনগণের বিশ্বাস শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০৪১ সালে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

প্রফেসর ড. প্রণব কুমার পান্ডে: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক, pranabpanday@yahoo.com

আকাশপথে বিরতিহীন আটলান্টিক পাড়ি

ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ

১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন অভিযাত্রীর বেলুনযাত্রার মধ্য দিয়ে আকাশপথে আটলান্টিক পাড়ি দেওয়ার প্রয়াস শুরু হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত সমুদ্রে পৌঁছানোর পূর্বেই সেটা ভূপতিত হওয়ায় প্রচেষ্টাটির পরিসমাপ্তি ঘটে। এর প্রায় চল্লিশ বছর পর ১৯১০ সালে একটি মার্কিন বিমানে চড়ে দুজন অভিযাত্রী আটলান্টিক পাড়ি দিতে উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু ৭০-৮০ হর্সপাওয়ারসম্পন্ন ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেওয়ায় চারদিন নিরুদ্দেশ যাত্রার পর তারা হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিমান তৈরির ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে ১৯১৯ সালের ১৬ই মে মার্কিন নৌবাহিনীর একটি ফ্লাইং-বোট নিউফাউন্ডল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করে ইউরোপের লিসবনে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। কিন্তু যেহেতু এর যাত্রাপথে অ্যাযোরস দ্বীপপুঞ্জে বিরতি ছিল, তাই একে মার্কিন সমুদ্রতীর থেকে ইউরোপ পর্যন্ত বিরতিহীন আটলান্টিক পাড়ি দেওয়া হিসেবে গণ্য করা হয়নি।

মার্কিনিদের এই প্রচেষ্টার কয়েকদিন পর হ্যারি হকার ও ম্যাকেঞ্জি গ্রীভ নামক দুজন ইংরেজ নিউফাউন্ডল্যান্ড থেকে আয়ারল্যান্ড পর্যন্ত বিরতিহীন বিমানযাত্রা শুরু করে। কিন্তু ৩৬০ হর্সপাওয়ারের ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেওয়ায় মিশনটি ব্যর্থ হয়। পাইলটদ্বয় একটি মাছ ধরার জাহাজে অবতরণ করে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল।

এরও প্রায় দুই মাস পর আরেকটি ব্রিটিশ অভিযাত্রীদল আটলান্টিক পাড়ি দিতে উদ্যত হয়। এ দলে ছিল ম্যানচেস্টারের ক্যাপ্টেন জন উইলিয়াম অ্যালকক ও লেফটেন্যান্ট আর্থার হুইটেন-ব্রাউন। তাদের অবলম্বন ছিল ৩৬০ হর্সপাওয়ারের রোলস রয়েস ইঞ্জিনসংবলিত উড়োজাহাজ 'দি ভিমি'। সাতাশ বছর বয়স্ক অ্যালকক ছিল একজন অভিজ্ঞ পাইলট। অন্যদিকে তেত্রিশ বছর বয়স্ক ব্রাউন ছিল দক্ষ ন্যাভিগেটর। আটলান্টিক পাড়ি দেওয়ার মতো দুরূহ কাজের জন্য তাদের চেয়ে যোগ্যতর জুটি হয়ত সে সময়ে পাওয়া যেত না। কীভাবে তারা সফল হয়ে বিমানযাত্রার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করেছিল, সেই অবিস্মরণীয় অভিযানের মহাকাব্যিক বিবরণ নীচে তুলে ধরা হলো।

সেদিন ছিল ১৪ই জুন ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ। স্থানটি নিউফাউন্ডল্যান্ডের সেইন্ট জন'স-এর নিকটবর্তী লেস্টার'স ফিল্ড। 'দি ভিমি' ওড়ার জন্য তৈরি ছিল। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত ঝড়ো বাতাসের গতি খুব একটা কমল না। কেবল ৫টার সামান্য পরে মনে হলো বাতাসের গতিবেগ কিছুটা কমে এসেছে। বিশাল বাইপ্লেনটিতে ৮৬৫ গ্যালন পেট্রোল ভরা ছিল, যার ওজন তিন টনেরও বেশি। এর বহিরাবরণ ছিল সাদামাটা আর আকারে সমকালীন বিমানের তুলনায় অনেক ছোটো। তবে অবয়বের দিক দিয়ে এটি সে যুগের যে-কোনো যুদ্ধ বিমান কিংবা দুই ইঞ্জিনবিশিষ্ট উড়োজাহাজের সমকক্ষ ছিল।

সামনের খোলা ককপিটে দুই বৈমানিক পাশাপাশি উপবিষ্ট হলো। উড্ডয়নের জন্য অ্যালককের সামনে ছিল ১ হাজার ফিট দীর্ঘ একটি রানওয়ে, সেই সাথে প্রতিকূল বাতাস; ৯০০ ফিটের মাথায় চাকাগুলো উপত্যকার উপর দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগুতে লাগল। বাতাসের তোড়ে বিমানটি কয়েকবার হুমড়ি খাওয়ার উপক্রম হলেও উপত্যকার শেষ মাথায় পৌঁছানো পর্যন্ত অ্যালকক তার নিশানা ঠিক রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সেইন্ট জন'স পর্বতের শেষ কয়েক ফিট তাদের অনেক কষ্টে অতিক্রম করতে হলো।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশাল আটলান্টিকের ওপরে বৈমানিকদ্বয় বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল; এর কারণ, যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম অর্থাৎ ওয়্যারলেসটি বিকল হয়ে যাওয়া। তবে এই বিশাল পৃথিবীর কোনো বিন্দু থেকে সাহায্য চাওয়া বা পাওয়ার সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই জেনেও তারা বিমানটি চালিয়ে যেতে থাকল। কয়েক মিনিট পর বিমানটি একটি নিরাপদ উচ্চতায় উঠে সমুদ্রের উপরে আরোহণ করল। এবার ব্রাউন গতিপথ সম্পর্কে অ্যালককে নির্দেশনা দেওয়া শুরু করল।

যাত্রা শুরুর পর সামগ্রিক অবস্থা ভালো বলেই মনে হচ্ছিল। আটত্রিশ মাইল বেগে সামনের দিকে ধাবমান বাতাস বিমানটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছিল। ফলে একদিকে যেমন তেল বাঁচল, তেমনি গতিও বৃদ্ধি পেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তারা প্রথম বিপদের সম্মুখীন হলো। বৈদ্যুতিক জেনারেটরের ড্রাইভিং শ্যাফ্‌টা গেল ভেঙে; এর ফলে ওয়্যারলেস সেটটি হয়ে গেল বিকল আর বহির্বিশ্ব থেকে বিমানটি হয়ে পড়ল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সাহায্যের জন্য তাদের কোথাও আবেদন করার সুযোগও আর রইল না। এটা জানা সত্ত্বেও অজানার উদ্দেশে তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখল দুই অসম সাহসী বৈমানিক।

ওদিকে বাতাসের বেগের কারণে নীচে আটলান্টিকের ঢেউগুলোকে মনে হচ্ছিল ভাসমান সফেদ চূড়ার মতো। এই সাদা ঢেউ যতক্ষণ দৃষ্টিতে রইল ততক্ষণ স্রোতের গতিপথ দেখে দেখে ব্রাউন তার দিক-

নিশানা ঠিক করতে পারছিল। কিন্তু ঠিক এরপরই নিউফাউন্ডল্যান্ডের ঘন কুয়াশা তাদেরকে ঢেকে ফেলল।

পরবর্তী সাত ঘণ্টা ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়েই তাদেরকে উড়তে হলো। হুইটেন-ব্রাউনের জন্য এ সময়টা ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। কম্পাস, ঘড়ির কাঁটা আর বাতাসের গতিই ছিল কেবল দিক নির্ধারণের একমাত্র অবলম্বন; বলতে গেলে সম্পূর্ণ আন্দাজের ওপর নির্ভর করেই তাকে গতিপথ ঠিক করতে হচ্ছিল। বাতাসের গতিতে পরিবর্তন এলে এই অনুমানের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিচ্যুতি ঘটতে পারত, আর স্থলে পৌঁছানো হয়ত কোনোকালেই সম্ভব হতো না। আটলান্টিকের সাদা ঢেউ দেখে আগে যদিও বা দিক-নিশানা ঠিক রাখা যাচ্ছিল, বিমানটি নিউফাউন্ডল্যান্ডের ঘন কুয়াশার মধ্যে ঢুকে পড়ায় সামনে এক গজও নজরে আসছিল না। পরবর্তী সাত ঘণ্টা ছিল তাই দুঃস্বপ্নের মতো।

ব্রাউন যখন বিমানের গতিপথ পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষায় ব্যস্ত, অ্যালকক তখন দিগন্ত-রেখার সঙ্গে যাত্রাপথ সমান্তরালে রাখার ব্যাপারে সজাগ। এটা বলাই বাহুল্য যে, যথেষ্ট অভিজ্ঞ পাইলটের জন্যও কাজটি ছিল অত্যন্ত দুরূহ; আর সময় পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিও হয়ে উঠছিল অসহনীয়।

ব্রাউন আশা করছিল তার সেক্সট্যান্ট যন্ত্রটি হয়ত এরই মধ্যে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু সূর্য সারাক্ষণ আড়ালে থাকায় তা সম্ভব হলো না। মাঝে-মধ্যে অবশ্য বাতাসের তোড় অথবা বরফখণ্ডের সঙ্গে ভাসমান সমুদ্র-স্রোতের সাদা চূড়াগুলো দৃশ্যমান হচ্ছিল। এই স্রোতের গতিধারা দেখে ব্রাউন তার যাত্রাপথ সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছিল, আর তাতেই সে সন্তুষ্ট ছিল।

অ্যালকক ও ব্রাউন আশা করছিল রাত শুরু হওয়ার আগেই তারা কুয়াশার আচ্ছাদন থেকে বেরুতে পারবে। কিন্তু বিলম্ব-যাত্রার কারণে এটা সম্ভব হলো না। রাত শুরুর পরেও তারা তাই ঘন কুয়াশার মধ্যে থেকে গেল। এবার আলোর মাত্রাতিরিক্ত স্বল্পতা অ্যালককের অসুবিধা আরও বাড়িয়ে তুলল। বিমানটি উপরে উঠছে না নীচে নামছে এটা বোঝার একমাত্র উপায় ছিল গতিবেগ নির্দেশক-যন্ত্র। গতি বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ বিমানটি নীচের দিকে ঝাঁপ দিচ্ছে, আর কমার অর্থ উপরে উঠছে। অ্যালকক নির্দেশক যন্ত্রের কাঁটায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল, আর ব্রাউন গতিপথের হিসাবনিকাশে ব্যস্ত রইল। ব্রাউনের কাজটি আরও দুরূহ হয়ে উঠছিল এই কারণে যে সমুদ্র-স্রোত দেখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। অন্ধ অনুমানই তখন একমাত্র ভরসা।

মাঝরাতের দিকে আবহাওয়ার উন্নতি হলো। তবে ভালো আবহাওয়ায় উত্তরণের পর যা ঘটল, তা থেকে অতীতে কোনো বৈমানিকই রক্ষা পায়নি। আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে এক ভয়ংকর ঘূর্ণিপাকের সম্মুখীন হলো অ্যালকক ও ব্রাউন। নাবিকের বন্ধু 'ভেগা' নক্ষত্র আর 'ধ্রুবতারা' তখন মেঘের আড়াল থেকে আস্তে আস্তে উঁকি দিচ্ছিল। মনে হলো জীবনে এমন মনোমুগ্ধকর দৃশ্য অ্যালকক ও ব্রাউন আগে কখনও দেখেনি। ব্রাউন উঠে দাঁড়ালো; তার বরফশীতল হাত দিয়ে সেক্সট্যান্ট যন্ত্রটি ধরে সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল। কিন্তু হিমশীতল বরফ প্রচণ্ড বেগে ব্রাউনের মুখের উপর আছড়ে পড়ল। তবে যন্ত্রের ফাঁক দিয়ে সে দেখে আশ্বস্ত হলো যে 'দি ভিমি' সঠিক যাত্রাপথেই রয়েছে।

কিন্তু ভালো আবহাওয়া খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। আধাঘণ্টা পরেই আবার ঘন মেঘ চারদিক ছেয়ে ফেলল। এবার মেঘের সঙ্গে এলো প্রচণ্ড ঝাপটা। মনে হলো সমুদ্রে স্টিমারের মতোই বিমানটি আছাড় খেয়ে খেয়ে এগিয়ে চলেছে। এর ফলে বিমানের বহিরাবরণে বরফের স্তর জমতে লাগল, আর একসময় গতিনির্দেশক যন্ত্রের পাইলট-টিউবও জমে গেল। ফলে যন্ত্রটি দেখে গতি মাপা আর সম্ভব হলো না। এভাবে অ্যালককের দিক-নির্দেশকটিও অচল হয়ে পড়ল। দিগন্তরেখা আবার অন্ধকারে আচ্ছাদিত হলো। সমুদ্র হলো অদৃশ্য, আর ঝড়ো বাতাসে ঝাঁকুনি খেতে খেতে দিক-নিশানাহীন অবস্থায় 'দি ভিমি' এগিয়ে চলল।

এভাবে আটলান্টিক মহাসাগরের ৪০ হাজার ফিট উপর দিয়ে অসহায় ও অন্ধের মতো অ্যালকক ও ব্রাউন অগ্রসর হতে থাকল। এরপর যা

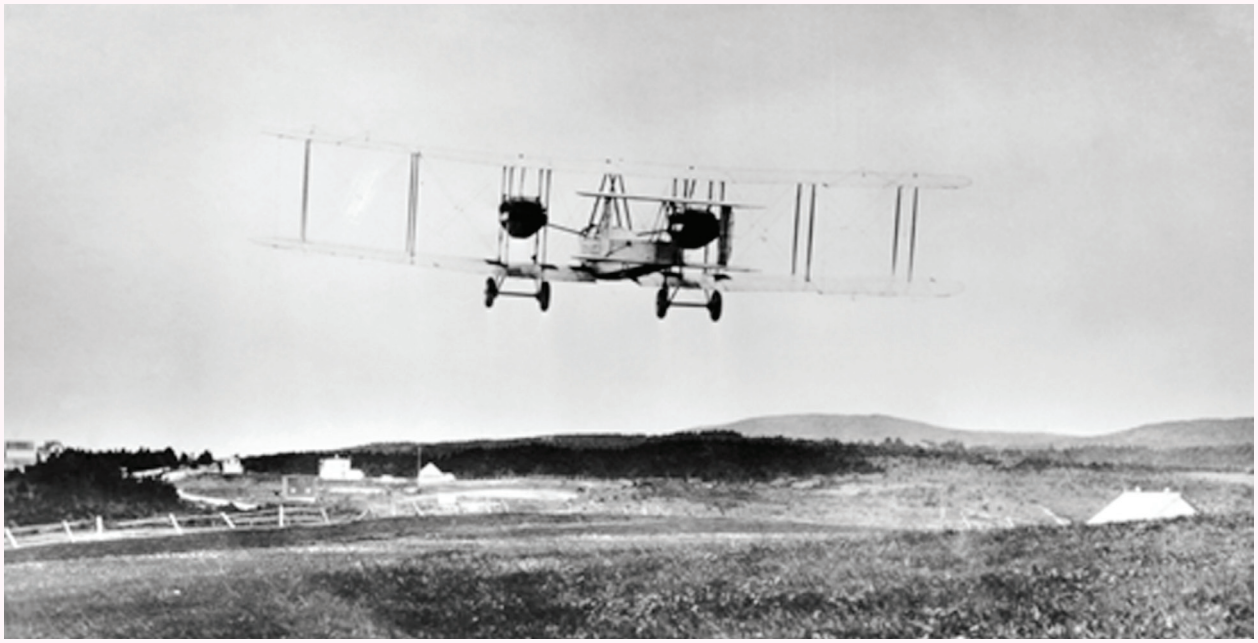

ঘটল তা থেকে আটলান্টিক পাড়িদানকারী অল্প কয়েকজনই শেষ পর্যন্ত প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল। এটা ছিল ঘূর্ণিপাক।

ঘূর্ণিপাক এমনকি ঘূর্ণনের উপযুক্ত করে নির্মাণ করা যুদ্ধবিমানের জন্যও অস্বস্তিকর ও মারাত্মক বিপজ্জনক। কিন্তু দুই-ইঞ্জিনবিশিষ্ট 'দি ভিমি'কে এ জাতীয় পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তৈরি করা হয়নি। অধিকন্তু, যেখানে বিমানটিকে রক্ষা করার মতো কোনো যন্ত্র কিংবা দৃশ্যমান দিগন্তরেখা ছিল না, সেখানে একজন অতি অভিজ্ঞ পাইলটের জন্যও টিকে থাকাটাই ছিল প্রায় অসম্ভব। এ অবস্থায় সমান্তরালে আসতে ব্যর্থ হয়ে বিমানটি বার বার ঘুরপাক খেতে থাকল। এমনই এক পতনের সময় বৈমানিকদ্বয় যখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল, তখন দেখা গেল বিমানের পতনোন্মুখ নাকের ডগায় আটলান্টিকের জলরাশি চাঁদের আলোয় চকচক করছে। এক মুহূর্ত দেরি হলেই এই জলরাশিতে তারা চিরতরে হারিয়ে যেত। কিন্তু অ্যালককের জন্য সেই একটি মুহূর্তই ছিল যথেষ্ট। সে বিমানটিকে ঘুরিয়ে ফেলল।

সমুদ্রপৃষ্ঠের দিকে ধাবমান সেই মুহূর্তগুলোয় প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল বৈমানিকদের কেউই পরে তা বিস্তারিত বলতে পারেনি। তবে অ্যালককের মনে হয়েছিল বিমানটি একটি ইউ-টার্ন নিয়েছিল, আর কোনো একটি মুহূর্তে হয়ত পিঠ-উল্টানোরত অবস্থায়ও ছিল।

মেঘ তখন এতই নীচুতে যে এর নীচ দিয়ে ওড়া সম্ভব ছিল না। মেঘের ভেতর দিয়ে ওড়ার বিপদ এর মধ্যেই তারা টের পেয়েছিল। অ্যালকক ঘন মেঘের মধ্য দিয়ে সোজা ৭০০ ফিট উচ্চতায় উঠে মেঘমুক্ত আকাশে হাজির হলো। এই উচ্চতায় শীতের তীব্রতা ছিল মারাত্মক। অ্যালকক ও ব্রাউনের মুখাবয়ব ও আঙুল শীতে হিম হয়ে গেল, আর বিমানপৃষ্ঠেও বরফের আস্তরণ জমতে থাকল। এ অবস্থায় ডানায় জমে ওঠা বরফ বিমানের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে পারত। সেক্ষেত্রে বিমানকে নীচে নামিয়ে ফেলাটাই ছিল নিরাপদ। তবুও অ্যালককের দক্ষতার কারণে একই উচ্চতায় থেকেও তারা বেঁচে গেল।

উঁচুতে ওঠার পরও দৃষ্টি কিন্তু ঝাপসাই ছিল। এর ফলে অ্যালককে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল; তবু সে ক্রমশ উপরে উঠতে লাগল। মেঘরাশি কিন্তু তাড়া করতে করতে তাদের পেছনেই রয়ে গেল। কিছু দুর্লভ মুহূর্তে অবশ্য অ্যালকক চাঁদের পূর্ণাবয়ব দেখারও সুযোগ পেয়েছিল।

সুদীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর বহুল প্রতীক্ষিত সেই ভোরের আগমন ঘটল। তখন ভোর প্রায় ছয়টা। এবার 'দি ভিমি' আরও উপরে উঠে এলো; ১১ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত সূর্যের কিরণ এবার মেঘের ফাঁক দিয়ে প্রলম্বিত হলো। ব্রাউন অনেকক্ষণ পর তার অবস্থান আবার পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ পেল। বোঝা গেল, অতি আশ্চর্যজনকভাবে তাদের অভিযান প্রায় শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে। বিমানটিকে এবার আরও নীচে নামানো হলো। এবার সমুদ্র ও মেঘের মাঝখান দিয়ে 'দি ভিমি' অগ্রসর হতে থাকল।

সমুদ্রের স্রোতোধারা দেখে ব্রাউন আবার তার গতিপথ শুধরে নিল। প্রায় এক ঘণ্টা এভাবে চলার পর দুটো দ্বীপ সমুদ্রবক্ষে ভেসে উঠল, আয়ারল্যান্ডের গ্যালওয়ে থেকে যেগুলোর দূরত্ব ছিল মাত্র পাঁচ মাইল। দুই ক্লান্ত বৈমানিকের কাছে শক্ত কঠিন মাটি হয়ত আর কখনও এত প্রিয় মনে হয়নি। মূল ভূখণ্ড তখনও কুয়াশা আর বৃষ্টিতে ঢাকা। অকস্মাৎ জলীয় বাষ্প ভেদ করে কয়েকটি পাহাড় যাত্রাপথে আবির্ভূত হলো। অত্যন্ত স্বস্তির সাথে বৈমানিকেরা উপলব্ধি করল তাদের কর্তব্য-কর্ম সমাধা হয়েছে। সত্যিই তারা বিরতিহীনভাবে আটলান্টিক পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছে। এবার ক্লিফডেল ওয়্যারলেস ঘাঁটি দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এলো। অ্যালকক ঘাঁটির চারদিকে একবার চক্রাকারে ঘুরল; এরপর অবতরণ-ভূমির খোঁজে শহরের চারদিকে একটি চক্কর মারল। আবহাওয়া আরও খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছিল। তাই ইংল্যান্ডের দিকে এগোনোর পরিবর্তে অ্যালকক যে-কোনো সুবিধাজনক স্থানে অবতরণের সিদ্ধান্ত নিলো। ওয়্যারলেস ঘাঁটির অতি নিকটেই তখন সবুজ ঘাসে ছাওয়া একটি মনোরম ভূখণ্ড দেখা যাচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটি ডোবা জাতীয় স্থান। বিমান এই স্থানটি কোনোক্রমে পার হয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে এসে পড়ল। সৌভাগ্যবশত বৈমানিকদের কেউ আহত হলো না।

আটলান্টিক মহাসাগরের এক তীর হতে আরেক তীরে ১,৯০০ মাইল অতিক্রম করতে 'দি ভিমি'র সময় লেগেছিল ১৫ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট। স্বল্প-গতির ভিমির পক্ষে প্রতি ঘণ্টায় এই ১১০ মাইল ওড়া সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র সমুদ্রগামী সহায়ক বাতাসের কারণে। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটা রেকর্ড যা পরবর্তীতে এমনকি লিন্ডবার্গ বা চেম্বারলেইনও দ্রুততর বিমান থাকা স্বত্ত্বও ভঙ্গ করতে পারেনি।

এই সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বৈমানিকদ্বয়কে এক হাজার পাউন্ডের 'ডেইলি মেইল' পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারও তাদেরকে নাইটহুডে ভূষিত করে। অ্যালকক অবশ্য এরপর খুব বেশিদিন বাঁচেননি। ফ্রান্সে বিমান ডেলিভারি দিতে গিয়ে তিনি দুর্ঘটনায় নিহত হন। ব্রাউন দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন; কিন্তু কল্পনার রোমান্টিক নায়কের বিপরীতে তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন। বিনয় কিংবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, বৈমানিকদ্বয়ের এই কালজয়ী কীর্তি কিন্তু প্রাপ্য স্বীকৃতিটুকু পায়নি। ১৯২৭ সালে চার্লস লিন্ডবার্গ যখন আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন, তখন কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করেছিল যে তিনিই হয়ত বিরতিহীনভাবে আটলান্টিক পাড়ি দেওয়া প্রথম বৈমানিক। আজও অনেক মার্কিনি তা-ই মনে করে। তবে একটি সাফল্যের সঠিক মূল্যায়ন শুধু তার খ্যাতির ওপর নির্ভরশীল নয়। চূড়ান্ত প্রতিকূল পরিবেশে অ্যালকক ও ব্রাউন যে দক্ষতা ও কুশলতার সঙ্গে বিমান চালিয়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিল, আকাশ জয়ের ইতিহাসে তা মহাকাব্য হিসেবেই অমর হয়ে থাকবে।

ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ: অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক, hahmed1960@gmail.com

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

নৈতিকতা ও সততা
জীবনে আনে পবিত্রতা

ক্যামেরা আবিষ্কার ও চলচ্চিত্র

স. ম. গোলাম কিবরিয়া

চলচ্চিত্রের আবির্ভাব যেভাবে

১৮৮৯ সালের ৬ই অক্টোবর। এডিসন তাঁর প্রিয় ওয়েস্ট ওরেঞ্জ স্টুডিওতে প্রবেশ করছেন। পর্দায় ভেসে উঠল ডিকসনের ছবি। এডিসন দেখলেন ডিকসন তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বলছেন, 'Good morning Mr. Edison, glad to see you back. I hope you are satisfied with the kineto-photograph'। শুরু হলো সৃষ্টির এক নতুন উন্মাদনা। এর আগে নির্বাক ছবি প্রদর্শিত হয়েছে বেশকিছু। কিন্তু নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছিল ছবির কথা ধারণ করা নিয়ে। এই ছবিটিতে শব্দ দেওয়া হয়েছিল ফনোগ্রাফ রেকর্ডের সাহায্যে। তবে সবাক ছবি নির্মাণে এ প্রচেষ্টায় একে মাইলফলক বলা যায়। ঘটনাটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ছবি পর্দায় প্রক্ষেপণ এবং এর সাথে শব্দের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা। সে জন্য অনেকেই এই ছবিটিকে পৃথিবীর প্রথম সবাক চলচ্চিত্র বলে থাকেন।

ডিকসনের এ প্রচেষ্টাই পরবর্তীতে এডিসনের ওয়েস্ট অরেঞ্জ স্টুডিওর পাঁচ নম্বর ঘরে জন্ম দিয়েছিল শিশু চলচ্চিত্রের। এ জন্য বটে এডিসন এবং ডিকসন পরস্পরের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। কিন্তু চলচ্চিত্রের বর্তমান পর্যায়ে আসতে বহু জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর নিরলস প্রচেষ্টা, প্রাণান্তর সংগ্রাম করতে হয়েছে। সে কারণে চলচ্চিত্র আবিষ্কারে কাউকে এককভাবে কৃতিত্ব দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। চলচ্চিত্র আবিষ্কারের সাথে ক্যামেরা আবিষ্কার, চলমান বস্তুর চিত্র গ্রহণের প্রচেষ্টা, ছবি প্রক্ষেপণের বিষয় ইত্যাদি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে চলচ্চিত্রের ইতিহাস লিখতে গেলে দৃষ্টি বিজ্ঞানের কথা চলে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গেই এসে যায় গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রিষ্টপূর্ব) নাম। রাসায়নিক বস্তুর আলোক সংবেদনশীলতার প্রসঙ্গ এলে মনে পড়ে প্রায় পঁচিশ শত বছর পূর্বের চীনা বিজ্ঞানী মো জু (Mo Tzu)-এর নাম।

১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ক্যামেরা বাস্তবে রূপ পেল জেলা পোরতা (১৫৪৩-১৬১৫)'র হাতে। পরবর্তীতে ১৬২০ সালে ইতালির ঐ আবিষ্কার জার্মান বিজ্ঞানী কেপলারের (১৫৭১-১৬৩০) হাতে এসে উন্নতি সাধিত হলো। কিন্তু এ আবিষ্কারের পূর্বে ইতালির চিত্রশিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) ক্যামেরা অবসকিউরা'র বিস্তারিত ধারণার বর্ণনা দেন। এ ক্যামেরা অবসকিউরা আবিষ্কার ও উন্নয়নের সাথে জড়িয়ে রয়েছে দান্তে (Danti-1573), কারচার (Athanasius Kircher: 1601-1680) সহ অনেক মনীষীর নাম।

ক্যামেরা অবসকিউরার দ্বারা ছবি গ্রহণ করা হলেও ছবিকে স্থায়ী রূপদান তখনও সম্ভব হয়নি। কিন্তু কারচার ম্যাজিক লণ্ঠনের বর্ণনা দিয়ে মানুষকে কৌতূহলী করে তুললেন। প্রকৃতপক্ষে এই ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে যখন ছবি দেখানোর কাজ বেশ জোরেসোরে চলছিল, তখন কিছু লোক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন কীভাবে ছবিকে স্থায়ী রূপ দেওয়া যায়। চলমান বস্তুর ছবি তোলা সম্ভব কি না বা চলমান ছবি দেখানো সম্ভব কি না ইত্যাদি বিষয় তখনও সমাধান হয়নি। এ সময়ে জার্মান বিজ্ঞানী শুলজ (Johann Heinrich Schulze: 1687-1744) দেখলেন সিলভার নাইট্রেট এবং চকের মিশ্রণ আলোর সংস্পর্শে কালো হয়ে যায়। তিনি ১৭২৫ সালে Contract Copy তৈরি করেন। যদিও এভাবে ছবি স্থায়ী করা গেল না কিন্তু ছবির স্থায়িত্ব প্রদানে রাসায়নিক বস্তুকে কাজে লাগানোর চিন্তা বিকশিত হলো।

এভাবে ছবি ও ছবির স্থায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে যখন গবেষণা চলছিল, তখন ১৮০৭ সালে ইংল্যান্ডে ক্যামেরা লুসিডা আবিষ্কার হলো। বৈজ্ঞানিক ওলাসটন ১৬৬৮ সালে নির্মিত হুকের ক্যামেরায় মিনিসকাস লেন্স ব্যবহার করে ফোকাস দৈর্ঘ্যের সঠিক অনুপাত দিতে সক্ষম হলেন।

ক্যামেরায় তোলা ছবির স্থায়িত্ব প্রদানের বিষয় নিয়ে ফ্রান্সে নিয়েপস (Joseph Nicephore Niepce: 1765-1833) নামের এক মুদ্রণশিল্পী বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু তিনি সফল হতে পারেননি। প্রায় একই সময়ে দ্যগিউর (Louis Jacques Mande Daguerre: 1787-1851) নামের একজন চিত্রশিল্পী এ বিষয়ে উৎসাহী হলেন। ১৮২৯ সালে নিয়েপস ও দ্যগিউর দশ বছরের চুক্তিতে আবদ্ধ হন যৌথভাবে কাজ করার জন্য। কিন্তু ১৮৩৩ সালে নিয়েপস হঠাৎ করে মারা যান। ১৮৩৯ সালের ৭ই জানুয়ারি দ্যগিউরের এক পদার্থ বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বেত্তা ও রাজনীতিক বন্ধু আরাগো (Fancois Arago) French Academy of Science-এর

সামনে ছবির স্থায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত দ্যগিউরের পদ্ধতি প্রকাশ করেন। ১৮৩৯ সালের ১৯শে আগস্ট ফ্রান্স সরকারের তরফ থেকে যখন পৃথিবীবাসীকে এ বিষয়ে ঘোষণা দেন, তখন দেখা গেল ১৪ই আগস্ট দ্যগিউর ইংল্যান্ড থেকে পেটেন্ট (Patent) নিয়ে বসে আছেন।

প্রতিচ্ছবি স্থায়ী করে রাখার বিষয়ে যখন উন্নতি সাধন ঘটল তখনও কিন্তু ছবির গতি সঞ্চারের বিষয়ে গবেষণা চলছিল। এ গবেষণার সাথে যে সকল বিজ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের নাম সম্পর্কিত তাঁরা হলেন– রোজেট (Peter Mark Roget), প্যারিস (John Ayrton Paris), প্লাটো (Joseph Antoine Ferdinand Plateau: 1801-1883), স্ট্যাম্ফার (Dr. Simon Von Stampher), উখাটিয়াস (Baror Franz Von Uchatius: 1811-1881), হর্নার (William George Horner: 1786-1837), দেভিনেজ (Desvignes), হারশেল (Sir John Frederik William Herschell: 1792-1871) প্রমুখ। হারশেলই প্রথম সোডিয়াম থায়োসালফেট ব্যবহার করেন প্রতিচ্ছবি স্থায়ী করার কাজে। ১৮৩৯ সালে ওলকট (Alexander Wolcott: 1804-1844) নামের এক আমেরিকান আয়না যুক্ত ক্যামেরা আবিষ্কার করেন। ১৮৪০ সালে পেতভ্যাল (Joschp Max Petzval: 1807-1891) তৈরি করেন ৩.৬ ফোকাসের লেন্স। ফলে ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ঘটল।

আমেরিকায় সেলারস (Coleman Sellers) নামে এক যন্ত্রবিদ তৈরি করলেন কিনেমাটোস্কোপ (Kinematoscope)। গতির ক্রমান্বয় পর্যায়ের একের পর এক ছবি তুললেন সেলারস। অভিনেতা হলেন সেলারসের ছেলে। বিষয়টি হলো Wheel of life-এর ছবিগুলো যেমন আঁকা ছিল, এক্ষেত্রে সেগুলো হলো ফটোগ্রাফি। সাধারণ একটা জোড়া লেন্স (twin lens) ক্যামেরা দিয়ে ছবিগুলোকে ঘনদৃক করে দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিনেমাটোস্কোপের আরও একটু উন্নতি সাধিত করলেন একই শহরে বসবাসকারী হেইল (Henry Renno Heyl)। হেইলই প্রথম ফটোগ্রাফ প্রক্ষেপণ করেন। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রে প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করা হতো কাঁচের উপর রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে। চলচ্চিত্রে সেলুলয়েড ব্যবহার প্রথম দেখতে পাওয়া যায় ১৮৮৬ সালে ইস্টম্যান (George Eastman: 1854-1932) এবং ওয়াকারের (W.H. Walker) তৈরি ফিল্মে। ইস্টম্যান চলচ্চিত্রের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গেছেন তার তুলনা মেলা ভার। তাঁরা যান্ত্রিক উপায়ে ফিল্মের উপর রাসায়নিক প্রলেপ লাগানোর ব্যবস্থা করেন ১৮৭৯ সালে। নমনীয় নেগেটিভ ফিল্ম চালু করেন ১৮৮৪ সালে এবং ১৮৮৮ সালে তৈরি করেন স্বচ্ছ ফিল্ম। বিশ্বের প্রথম রোল ফিল্ম ক্যামেরা 'কোডাক' উপহার দেন এই সময়ে। ১৯২৩ সালে ১৬ মিমি ফিল্ম ক্যামেরা, প্রজেক্টর এবং রঙিন ছবি তৈরির ক্ষেত্রেও তাঁর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা ছিল।

চলমান ছবি তোলার ব্যাপারে এক চাঞ্চল্যকর কাহিনির নায়ক ইংরেজ ফটোগ্রাফার মেব্রিজ (Edward James Muybridge: 1830-1904)। ছুটন্ত অবস্থাতেও ঘোড়ার পা মাটি ছুঁয়ে থাকে কি না তা নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর স্ট্যানফোর্ডের সাথে তাঁর বন্ধুদের বিতর্ক হয়। এর সমাধানের জন্য ছবি তুলতে ডাক পড়ে মেব্রিজের। কিন্তু মেব্রিজ ছবি তুলতে সক্ষম হলেন না। ফলে স্ট্যানফোর্ডের

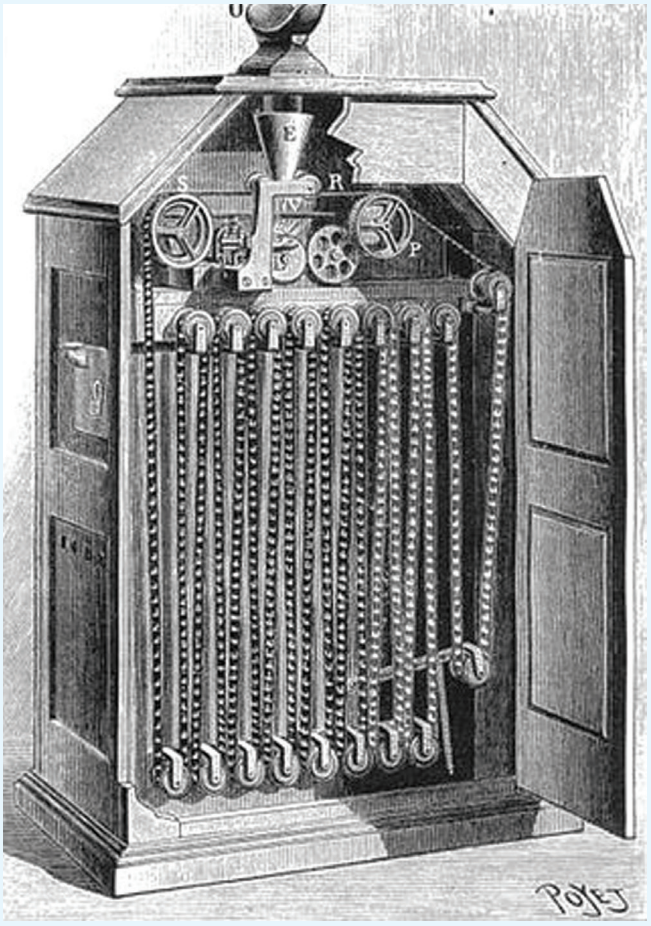

কিনেমাটোস্কোপ যন্ত্রের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য, একদম উপরিভাগে রয়েছে চোখ রাখার গর্ত

মধ্যে কৌতূহল ও জেদ চাপল। মেব্রিজ হাল ছাড়লেও স্ট্যানফোর্ড হাল ছাড়লেন না। তিনি রেল বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার আইজ্যাক (John D. Issac) নামে ফটোগ্রাফি ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকলেন। বৈদ্যুতিক চুম্বকের দ্বারা শাটারের ওঠানামার কাজ নিয়ন্ত্রিত করে আইজ্যাক ক্যামেরার প্রভূত উন্নতি সাধন করলেন। এবারে পরপর চব্বিশটা ক্যামেরা রেখে মেব্রিজ গতিশীল ঘোড়ার ছবি তুলতে সক্ষম হলেন। পুরো ঘটনায় স্ট্যানফোর্ডের খরচ হলো তখনকার দিনে ৪০ হাজার ডলার। চলমান বস্তুর ছবি গ্রহণের ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ নতুন দিগন্তের সূচনা করল।

চলমান বস্তুর ছবি গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি সাধিত হলেও ছবি ও শব্দের সমন্বয়ের বিষয়ে এডিসন তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ফনোগ্রাফ যন্ত্রের সিলিন্ডারে আলোক সংবেদনশীল রাসায়নিক পদার্থ লাগিয়ে ছবি গ্রহণে চেষ্টা চালালেন। সিলিন্ডার মেশিনে ছবি উঠত ঠিকই কিন্তু তার মান ছিল খুবই খারাপ। অট্ (Fred Ott) নামে এডিসনের স্টুডিওর মেকানিক ছিল সেই ক্যামেরার সামনে প্রথম অভিনেতা। এ সূত্রে অট্‌কে পৃথিবীর প্রথম চলচ্চিত্র অভিনেতাও বলা হয়। এ সকল ঘটনাকাল ১৮৮৮ সাল। এভাবে একদিন এসে গেল ১৮৮৯ সাল। এডিসন খবর পেলেন বিখ্যাত 'কোডাক' নির্মাতা ইস্টম্যান এক ধরনের নমনীয় পাতলা ফিল্ম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ সালে

ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানির কাছে চলচ্চিত্র তৈরির জন্য ফিল্মের অর্ডার এলো। এটাই ইস্টম্যান কোম্পানির প্রথম চলচ্চিত্র তৈরির জন্য ফিল্ম সরবরাহ। কাজ করলেন এডিসন এবং ডিকসন। আর কাজের এক পর্যায়ে এডিসনকে অভিবাদন জানিয়ে ডিকসন উন্মোচন করেছিলেন এক নতুন দিগন্তের।

ডিকসন ক্যামেরা চালক, পরিচালক এবং রসায়নগার কর্মী হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। এভাবে তিনি Trick Dog Teddy, The Gaiety Girls, Mexican Knife Thrower ইত্যাদি ছবি তুললেন। কলোম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চতুর্থ শতবর্ষ পালন উপলক্ষে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব মেলা। কিনেটোস্কোপের প্রথম বাণিজ্যিক প্রদর্শনী এই মেলায় করার কথা থাকলেও সম্ভব হয়নি। ১৪ই এপ্রিল ১৮৯৪ নিউইয়র্কের ১১৫৫ ব্রডওয়েতে কিনেটোস্কোপের প্রথম বাণিজ্যিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

আমেরিকার ল্যাথাম পরিবার ঔষধ ব্যবসায় যখন মার খাচ্ছিলেন তখন ব্রডওয়েতে প্রদর্শিত ছবি দেখে তারা চলচ্চিত্রের দিকে ঝুঁকলেন। 'এডিসন কোম্পানি'র সাথে যোগাযোগ করলেন। এডিসনকে রাজি করানোর পর উদ্যোগ নিলেন মুষ্টিযুদ্ধের ছবি তোলার জন্য। ১৮৯৪ সালের জুলাই মাসে এডিসনের 'ব্লাকমারিয়া' স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত দশ রাউন্ডের মুষ্টিযুদ্ধ। এ লড়াইয়ে ছয় রাউন্ডের ছবি তোলা হলো। এ ছবি তুলতে প্রায় এক হাজার ফুট ফিল্ম খরচ হলো। সে সময় অবধি এটা ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ চলচ্চিত্র। এ ছবি প্রদর্শনকালে দর্শকদের ভিড় সামলাতে পুলিশ ডাকতে হয়েছিল। ল্যাথামের প্রাথমিক সাফল্যের পর এমন ছবি তৈরিতে উৎসাহী হলেন। আবার তৈরি করলেন করবেট (James Corbett) এবং কার্টানের (Pete Courtney) মুষ্টিযুদ্ধের ছবি। সুদর্শনের জন্য কারবেটের পরিচিতি ছিল Gentleman Jim নামে। ল্যাথাম জিমের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন, যাতে অন্য কোনো কোম্পানি ছবি তুলতে না পারে। কারবেট প্রথম চিত্র তারকা যিনি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। এভাবে চলচ্চিত্র ধীরে ধীরে বাণিজ্যিক বিষয় হিসেবে এগিয়ে যেতে থাকে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তখনও পর্দায় ছবি প্রক্ষেপণের বিষয়টি জটিল পর্যায়েই রয়ে গেছে। এ প্রক্ষেপণ যন্ত্র নিয়ে এডিসন ও ল্যাথামের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। এ সময়ে প্রক্ষেপণ যন্ত্রের উন্নতি সাধনে বিভিন্ন গবেষণার কাজ চলেছে। ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসে কিনেমাটোস্কোপ দেখলেন লুই লুমিয়ের (Louis Lumiere: 1864-1948) ।

লুই লুমিয়ের ছিলেন ফটোগ্রাফি ব্যাবসার সাথে জড়িত। তিনি চলচ্চিত্রকে পর্দায় আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এগিয়ে এলেন তাঁর ভাই অগাস্ট লুমিয়ের (Auguste Lumiere: 1862-1954)। লুমিয়েররা প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে সবিরাম গতির প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিলেন। তাঁরা সেকেন্ডে ৪৮টা ছবি প্রক্ষেপণের চেয়ে ১০টি ছবি প্রক্ষেপণে চেষ্টা চালালেন। কিন্তু দেখা গেল তাতে ছবির গতি মন্থর হয়ে যায়। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন সেকেন্ডে ১৬টি ছবি প্রক্ষেপণের। ১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লুমিয়েররা যন্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারি পেটেন্ট পেলেন। এ ক্যামেরা প্রজেক্টরের নাম হলো 'সিনেমাটোগ্রাফ' (Cinematograph)। লুমিয়েররা এ যন্ত্র দিয়ে ছবি তোলা শুরু করলেন। বাড়ির বাগানে বসে অগাস্ট,

ফ্রান্সের লিও শহরের লুমিয়ের ইনস্টিটিউটে রাখা 'লুমিয়ের সিনেমাটোগ্রাফ' যন্ত্র

তাঁর স্ত্রী এবং বাচ্চারা খাচ্ছে– এমন দৃশ্যের ছবি তুললেন লুই। Le Repas de Bede নামে এ ছবি প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পায়। ১৮৯৫ সালের ২২শে মার্চ প্রথম দেখানো হলো তাঁদের ছবি। এ বছরের ১০ই জুন দেখলেন ফরাসি ফটোগ্রাফি সোসাইটি (Corgres de l' union Nationale des Societies Photographiques de France)। ব্যবসায়িকভাবে সিনেমাটোগ্রাফের প্রদর্শন শুরু হলো ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৯৫ সালে গ্রান্ড কাফেতে (Salon Indien, Grand Gafe', Boulevard des Capucines)। জনসাধারণ এক ফ্রাঁয়ের বিনিময়ে দেখতে পেলেন লুমিয়েরদের সিনেমাটোগ্রাফের ছবি। সেদিনের প্রদর্শন করা ছবিগুলো হলো– 1. La Sorlie de l'usine LUMIERE alyon, 2. La Voltige, 3. La peche aux possions Rouges, 4. La Debarquement du Congres de photograpie a Lyon, 5. Les Forgerons, 6. Les Jardinier, 7. Le Repas, 8. Le Sant a la Couverture, 9. La place des cordeliers a lyon, 10. La Mer– এই চলচ্চিত্র পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি করল এক অনন্য ইতিহাস। (চলবে...)

স. ম. গোলাম কিবরিয়া: মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)

‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গঠনে তথ্য অধিকার সচেতনতা

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

একটা সময় পর্যন্ত প্রতাপশালীরা সত্যজিৎ রায়ের *হীরক রাজার দেশে*’র সেই ঐতিহাসিক সংলাপের মতোই ভাবতেন– ‘এরা যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, তত কম মানে’।

মানব সভ্যতার গোড়া থেকে সামন্তবাদী সমাজ হয়ে ঔপনিবেশিক শাসন পর্যন্ত সাধারণ সংস্কৃতি ও মনস্তত্ব ছিল এরকম– জ্ঞান এবং তথ্য হলো রাষ্ট্র, সরকার ও ক্ষমতাধর মানুষের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণে থাকার বিষয়। এগুলো সর্বসাধারণের অধিগম্য নয়।

সেই ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে বিশ্বের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সুইডেন ১৭৬৬-তে তথ্য জানার স্বাধীনতা নিয়ে বিশ্বে প্রথম একটি আইন প্রণয়ন করে। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্স তাদের সংবিধানের ১৪নং আর্টিকেলে তথ্য অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে।

তারও ১৫৭ বছর পর ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ একটি রেজ্যুলেশন গ্রহণ করে যার ৫৯(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– ‘Freedom of Information is a fundamental right and is the touchstone of all the freedoms to which the United Nations is consecrated. Freedom of Information implies the right to gather, transmit and publish news anywhere and everywhere without fetters. As such it is an essential factor in any serious effort to promote the peace and progress of the word.’

একুশ শতকে এসেও যে এ মানসিকতার খুব বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে এমন নয়। বিশ্বের অনেক দেশে এখনও গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ মুক্তি ঘটেনি, যদিও প্রায় ১৩০টি দেশে তথ্য অধিকার আইন বলবৎ আছে। সাধারণ মানুষের মনেও এমন বোধ দৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠেনি যে জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত সব ধরনের তথ্য জানার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে।

পরে ১৯৬৬-এ যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৮১-এ কাউন্সিল অব ইউরোপ তথ্য অধিকার নিয়ে আইন প্রণয়ন করে। ধীরে ধীরে পৃথিবীর অনেক দেশে নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার আইনগতভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কিত নানা সূচকে বিভিন্ন দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

দক্ষিণ এশিয়ায় ২০০২ সালে ভারত ‘ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট’ প্রণয়ন করে; যার প্রেক্ষিতে ২০০৫ সালে ভারত পাস করে ‘তথ্য অধিকার আইন’। পাকিস্তান অনেক পরে, ২০১৭ সালে পাস করে ‘রাইট অব একসেস টু ইনফরমেশন’।

তথ্য অধিকার আইন: প্রেক্ষিত ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ ও ‘এসডিজি’

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনটি ২০০৯ সালে প্রণীত ও গৃহীত হয়েছিল বর্তমান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের উদ্যোগেই; একটি তথ্য কমিশন গঠিত হয় এবং একজন প্রধান তথ্য কমিশনারের নেতৃত্বে সেটি কাজ শুরু করে। প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেওয়ার পাশাপাশি ২০শে আগস্ট ২০২৩ কমিশনের নিজস্ব ভবনও উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সকল দপ্তরকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় আনা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে তথ্য প্রকাশে সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় সেই সময় নাগরিকদের অংশগ্রহণের যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল বিরল। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণ করা উচিত যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের ৩৯(১) ও ৩৯(২)(ক) অনুচ্ছেদে নাগরিকের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়ে রেখেছিলেন।

তথ্য অধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো নাগরিকদের ক্ষমতায়ন ঘটানো, সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, দুর্নীতি প্রতিহত করা; সর্বোপরি সকল ব্যবস্থা যেন জনগণের স্বার্থে কাজ করে, তা নিশ্চিত করা।

কাউকে পেছনে ফেলে নয়– এই অঙ্গীকার নিয়ে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ‘২০৩০ এজেন্ডা’ (এসডিজি) বাস্তবায়নে পুরো বিশ্ব আজ কাজ করছে। যার লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, সমাজের সর্বক্ষেত্রে অসমতা নিরসন। যার জন্য মুক্ত সমাজ অপরিহার্য যেখানে জনসাধারণের চিন্তা, বিবেক, বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। এজন্য প্রয়োজন তথ্যে অভিগম্যতা। এদিক দিয়ে দেখলে তথ্য অধিকার আইন টেকসই উন্নয়নের পরিপূরক। এসডিজি’র ১৬.১০ লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে– ‘জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা ও মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষাদান।’

২০৪১ সালের মধ্যে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গঠন করার যে রূপকল্প প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছেন তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে এই আইনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে, যেখানে আমাদের স্মার্ট জনগোষ্ঠী হবে, স্মার্ট ইকোনমি হবে, হবে স্মার্ট সোসাইটি এবং স্মার্ট গভর্নমেন্ট। জনগণকে তথ্যসমৃদ্ধ করে এবং জনসংলগ্ন থেকে রাষ্ট্রের উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে পারলে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণ নিশ্চিত করা যাবে, এই প্রত্যয় নিয়ে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

কী আছে আইনে?

শক্তিশালী এই তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী, সরকারি কর্তৃপক্ষগুলো সর্বোচ্চ পরিমাণ তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করবে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে; অর্থাৎ নাগরিক বা সাংবাদিকদের চাওয়ার অপেক্ষায় না থেকে সরকারি কর্তৃপক্ষগুলো নিজ নিজ দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কিত অধিকাংশ তথ্য নিজ নিজ ওয়েবসাইটে এবং অন্যান্য মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশ করবে। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য করার জন্য সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো তথ্য গোপন করতে বা এর সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করতে পারবে না। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে যেখানে সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-

কর্মচারীগণের দায়িত্ব; নিয়মকানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল, সিদ্ধান্ত, কর্মপদ্ধতিসহ আনুষঙ্গিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তথ্য কমিশন প্রবিধান দ্বারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করবে এবং সব কর্তৃপক্ষ তা অনুসরণ করবে।

কোনো ব্যক্তি তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন। তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে নির্ধারিত ফরমেটে হতে হবে। তবে ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হলে উপরিল্লিখিত তথ্যাবলি সন্নিবেশ করে সাদা কাগজে বা ক্ষেত্রমত, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাবে। তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসঙ্গত মূল্য পরিশোধ করতে হবে। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে বিনামূল্যে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

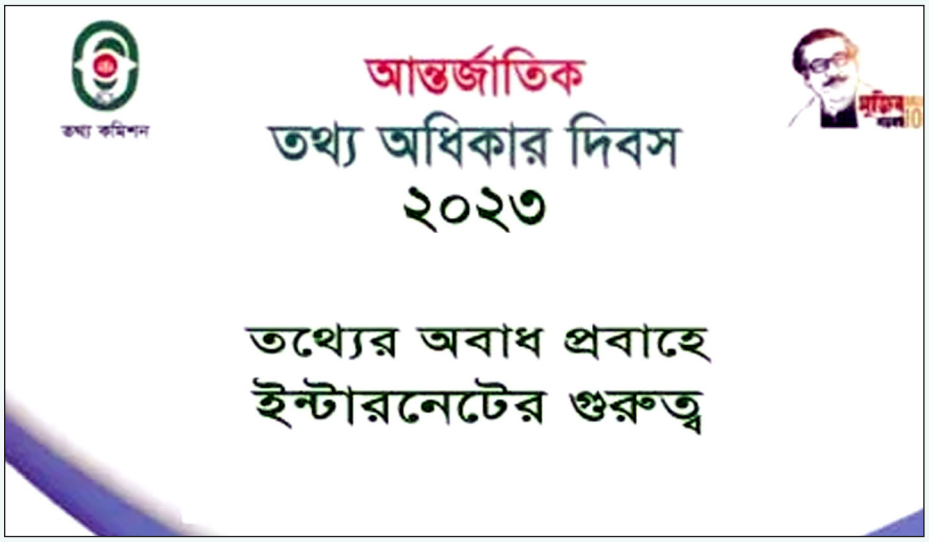

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ থেকে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি তা অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন। অনুরোধকৃত তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেপ্তার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন এবং কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তা করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। কোনো অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুত থাকলে তিনি তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা অনুযায়ী ঐ তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং তা অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।

কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোনো সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার বা সিদ্ধান্ত লাভ করার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করতে পারবেন।

আপিল কর্তৃপক্ষ যুক্তিসঙ্গত কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপিল আবেদন গ্রহণ করতে পারবেন। আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে আপিল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করবেন অথবা গ্রহণযোগ্য না হলে আপিল আবেদনটি খারিজ করে দিবেন।

তথ্য অধিকার আইনের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হচ্ছে এই আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের কোনো ক্ষেত্রে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন সাংঘর্ষিক হলে আইনের ধারা-৩ মোতাবেক এই আইনের বিধানাবলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে আমাদের দেশে একটি ভুল ধারণা হচ্ছে, সবকিছু 'পাবলিক' হতে হবে– যা ঠিক নয়, মানুষকে এটিও জানতে হবে। বিশ্বের প্রতিটি দেশেরই কিছু রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা থাকে যা প্রকাশযোগ্য নয়, সেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেন, ইউরোপে বলেন, সব দেশেই।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৩২(১) অনুসারে তফসিলে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান থেকে কিছু সংস্থাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

হাতের মুঠোয় বিশ্ব

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার বেসরকারি খাতকে উন্মুক্ত করে দেওয়ায় দেশে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং সংসদ টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪৪টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, ২২টি এফএম রেডিও এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও, ১৪টি আইপি টিভিসহ অসংখ্য সংবাদপত্র, অনলাইন পোর্টালের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। সাংবাদিকদের কল্যাণে 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ সহ বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

টেলিডেনসিটি উন্নীত হয়েছে ১০৮ শতাংশে। দেশে মোবাইল গ্রাহক ১৮ কোটির উপরে। মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে এমন গ্রাহকের সংখ্যা ১২ কোটি ৭০ লাখ।

সরকার মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছে। ফলে দেশের সকল টিভি চ্যানেল দেশীয় স্যাটেলাইট ব্যবহার করতে পারছে। কক্সবাজারে এবং কুয়াকাটায় সাবমেরিন ক্যাবল সংযুক্ত

করা হয়েছে, আরও একটি সংযোগের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে বিটিআরসি'র ব্যান্ডউইথ চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)-এর পাশাপাশি আরও তিনটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্তির লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। সারা দেশে অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তৃত হয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৪৮ কিলোমিটার। ২০১১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বিটিআরসি শুধু তরঙ্গ বরাদ্দ দিয়ে রাজস্ব আয় করেছে ৪ দশমিক ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি।

তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ যেন সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা পেতে পারে, সে লক্ষ্যে সরকার ৮ হাজার ৮৪৩টি ডিজিটাল সেন্টার এবং ৮ হাজার ৫০০টি পোস্ট ই-সেন্টার স্থাপন করেছে। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ৩৫ হাজার ২৫৬টি ওয়েবসাইট সংবলিত বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল 'তথ্য বাতায়ন' চালু করেছে সরকার।

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) বাস্তবায়নের মতোই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও বাংলাদেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন গণমাধ্যম ও জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতার মতো জায়গায় চ্যালেঞ্জগুলো উত্তরণেও এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। গ্লোবাল রাইট টু ইনফরমেশন রেটিং-এও অবস্থান সুসংহত করছে বাংলাদেশ।

তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের অগ্রগতি নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) একটি সংক্ষিপ্ত গবেষণা করেছে। ২০২০ সালের আগস্ট থেকে ২০২১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে ১৯২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫৩টি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ৩৯টি এনজিওর ওয়েবসাইটের ওপর সংগ্রহ করা তথ্যে দেখা গেছে, বেসরকারি সংস্থার চেয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশে আজ মানুষ সহজেই হাতের মুঠোয় তথ্য পেয়ে যাচ্ছে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠন করার যে রূপকল্প বাস্তবায়নে আমরা এগোচ্ছি সে লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনের সর্বোত্তম প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও মানসিকতার পরিবর্তন নিশ্চিত করছে সরকার। আইনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইনের আওতায় তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা ২০১২ ও তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০ প্রণীত হয়েছে। এছাড়াও তথ্য প্রাপ্তি, অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত পৃথক পৃথক বিধি, প্রবিধি ও সহায়িকা প্রণীত হয়েছে। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন ২০১১ প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা ২০১৭ জারি করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য কমিশন জনসচেতনতামূলক বিশেষ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে নিয়মিত। তথ্য প্রদানকারীদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তথ্য প্রকাশের মানসিকতাও বিকশিত হচ্ছে। স্বচ্ছতা বাড়ছে, বাড়ছে গতিশীলতা।

একইসঙ্গে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য চাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসাধারণকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন ও সক্রিয় অনুঘটক হিসেবে গড়ে তুলতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেত হবে।

পরীক্ষিৎ চৌধুরী: লেখক ও সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা, 1parcho@gmail.com

ওটিটি প্ল্যাটফর্মে হাসিনা: অ্যা ডটারস টেল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবনের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র *হাসিনা: অ্যা ডটারস টেল* এবার মুক্তি পাচ্ছে দেশের জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজের মুখ থেকে তাঁর বিদেশ জীবন, দেশে ফিরে আসার কথা শোনা যায় এই প্রামাণ্যচিত্রে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কথাও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নয়, বরং এই ডকুড্রামার মূল উপজীব্য বিষয় ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা। প্রামাণ্যচিত্রে বঙ্গবন্ধুর কন্যার ব্যক্তিগত জীবনের নানা গল্পের সাথে তুলে ধরা হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সেই ভয়াবহ সময়ের কথা, যে সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ১৯৭৫ সালের পর কীভাবে বাবা-মা-ভাই-স্বজন হারিয়ে শেখ হাসিনা বেঁচে ছিলেন তার ইতিহাস অনেকের কাছেই অজানা। সেই অজানা ইতিহাস সবার মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রামাণ্যচিত্রে। এ কারণেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সাথে এই প্রামাণ্যচিত্রটির সম্পৃক্ততার বিষয়টি মাথায় রেখে চরকিতে-এর মুক্তির দিন (১৫ই আগস্ট ২০২৩) ঠিক করা হয়েছে বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির সিইও রেদওয়ান রনি। *হাসিনা: অ্যা ডটারস টেল* প্রামাণ্যচিত্রটি প্রযোজনা করেছে সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) এবং অ্যাপলবক্স ফিল্মস। নির্মাণ করেছেন পিপলু আর খান।

প্রামাণ্যচিত্রটির নির্মাণ ভাবনা প্রসঙ্গে নির্মাতা বলেন, ডকুড্রামায় একজন শেখ হাসিনার রান্নাঘর থেকে শুরু করে সরকারপ্রধানের দায়িত্ব পালন, বেঁচে থাকার সংগ্রামসহ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাজনৈতিক জীবনের নানান দিক ফুটে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানার জীবনের কথাও উঠে এসেছে এতে। এই ডকুড্রামার মধ্য দিয়ে একটি সত্যনিষ্ঠ জীবনপ্রবাহকে পর্দায় হাজির করতে চেয়েছি।

প্রামাণ্যচিত্রটি ২০১৮ সালের ১৬ই নভেম্বর সারা দেশের নির্ধারিত সিনেমা হলে প্রথম প্রদর্শিত হয়। সিলভার স্ক্রিনে প্রদর্শনী শুরু হওয়ার পর থেকে পরবর্তী দুই সপ্তাহে বক্স অফিসে সবচেয়ে সফল ছিল প্রামাণ্যচিত্রটি। আন্তর্জাতিক বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত এবং প্রশংসিত হয় এটি। দর্শক চাহিদার কথা বিবেচনায় এনে প্রামাণ্যচিত্রটি পরবর্তীতে টেলিভিশন চ্যানেলেও সম্প্রচার করা হয়।

প্রতিবেদন: শুভ আহমেদ

পর্যটনশিল্প খুলে দিতে পারে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন দ্বার

মাহবুব রেজা

সদ্য স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর বাংলাদেশের রয়েছে চোখ জুড়ানো, মন ভোলানো সৌন্দর্য। সৃষ্টিকর্তা দু'হাত উজাড় করে এ দেশের প্রকৃতি আর সম্পদকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। এই সৌন্দর্য আর সম্পদের ফলে প্রাচীনকাল থেকে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষেরা এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন। ব্যাবসাবাণিজ্য থেকে শুরু করে ক্ষমতা সবই তারা করায়ত্ত করেছিলেন।

দেশের এই সৌন্দর্যকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে পারলে বহির্বিশ্বে যেমন বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি পাবে তেমনি আর্থিকভাবেও লাভবান হওয়া যাবে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তৎকালীন সরকার দেশে পর্যটনশিল্প বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে সংস্থাটিকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে রূপান্তর করা হয়। করপোরেশন বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় পর্যটন খাত বিকাশের একটি পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। পরিকল্পনায় দেশে পর্যটনের প্রাকৃতিক আকর্ষণসমূহের সম্ভাবনা বিকশিত করে তোলা এবং এর মাধ্যমে অধিক পরিমাণে বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ ও দেশে তাদের অবস্থান উপভোগ্য করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরপর থেকে সরকার প্রতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেই পর্যটন খাতের জন্য বাজেট বরাদ্দের বিধান অনুসরণ করে আসছে এবং বাজেটকৃত অর্থ পর্যটনের উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় করছে।

জানা যায়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কাপ্তাই, সিলেট, রাঙ্গামাটি এবং আরও বেশ কয়েকটি স্থানে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছে সেগুলো দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের ওপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই পর্যটকদের আকর্ষণের বহুবিধ বিষয় ও উপকরণ বিদ্যমান। রাজশাহী শহরের পদ্মা তীরে আছে বড়কুঠি ও বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর। বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের প্রতিষ্ঠিত সিল্ক ফ্যাক্টরি পর্যটকের জন্য আরেকটি আকর্ষণ। রাজশাহী শহর থেকে ৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত বাংলার মধ্যযুগীয় ইসলামিক ঐতিহ্যবাহী গৌড়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।

ভ্রমণ বিষয়ক গবেষকরা বলছেন, মূলত এ দেশে ১৯৬০-এর দশক থেকে পর্যটনশিল্পের ধারণাটির সূত্রপাত হয়েছে। সে সময় ইউরোপ-আমেরিকা থেকে পর্যটকরা এ দেশে আসতেন চট্টগ্রামের অবারিত জলরাশির সমুদ্রসৈকতের আকর্ষণে। সুন্দরবনসহ দেশের নানা প্রান্তে পর্যটকরা ঘুরে বেড়াতেন।

পর্যটনশিল্পের অধিকতর প্রসারের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে– দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো দেখে নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র চিহ্নিত করা, পর্যটকদের অন-অ্যারাইভাল ভিসা সহজ করা এবং ভিসার ব্যাপারে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া।

পর্যটন সংশ্লিষ্টদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, করোনা-পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা কাটাতে সরকার পর্যটনশিল্পকে বাঁচাতে দেড় হাজার কোটি টাকার ঘোষিত প্রণোদনা বিতরণের কাজ হাতে নিয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণও প্রদান করার পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

পর্যটন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, দেশের জিডিপিতে পর্যটনের অবদান ২ শতাংশ যা ১০ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব। এছাড়া করোনার আগে অর্থাৎ ২০১৯ সালে বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ক্রয়সংক্রান্ত প্রস্তাব মন্ত্রিসভা কমিটিতে অনুমোদন পায়। একই বছরের ২৮শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই মহাপরিকল্পনায় অনুমোদন দেন। ১০ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইপিই গ্লোবাল লিমিটেডের সঙ্গে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভ্যাট ও এআইটিসহ চুক্তিমূল্য প্রায় ২৮ কোটি ৬৬ লাখ টাকায় দাঁড়ায়। আঠারো মাসে মহাপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের কথা থাকলেও করোনার দাপটে থমকে যায় প্রকল্পের কাজ। পরে কিছু সংশোধনীসহ পুনরায় প্রকল্পটি অনুমোদন পায় ২০২০ সালের ১১ই নভেম্বর।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড গৃহীত মহাপরিকল্পনাটির প্রথম ধাপে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে। দেশের পর্যটনশিল্পের বর্তমান অবস্থা, সম্ভাবনা, সংকট, দুর্বলতাসহ বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে। দ্বিতীয় ধাপে পর্যটনের লক্ষ্য, পদক্ষেপ, কৌশলগত লক্ষ্য, অগ্রাধিকার ও যোগাযোগের ক্ষেত্র নির্ধারণ করে উন্নয়ন, প্রমোশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পর্যটন চিত্তবিনোদন বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ। বর্তমানে পর্যটন একটি উল্লেখযোগ্য সেবা খাত এবং পর্যটকদের আকর্ষণ করা বা তাদের আহার ও বাসস্থান সংস্থান, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি একটি ভালো ব্যাবসা। অনেক দেশে পর্যটন অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় ও বিদেশি মুদ্রা উপার্জনের একটি কার্যকর শিল্প খাত। পর্যটনের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অন্য যেসব ব্যাবসা বিকাশ লাভ করে সেগুলো হচ্ছে– স্থল, বিমান ও সমুদ্রপথে যাত্রী পরিবহণ, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, ব্যাংকিং, ট্রাভেল এজেন্সি ও ট্যুর অপারেটর কোম্পানি, গাড়ি ভাড়া প্রতিষ্ঠান ও নানারকম খুচরা পণ্যের দোকান। ফলে পর্যটনের উন্নয়ন সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে এবং এর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২

করোনা মহামারির শুরুর আগে সরকার পর্যটনশিল্প খাতে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে কক্সবাজারকে গড়ে তোলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন জোন হিসেবে। ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্রে রূপ

দিতে টেকনাফের সাবরাংয়ে 'সাবরাং অর্থনৈতিক অঞ্চল' নামে পর্যটনকেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন। যেখানে গড়ে তোলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের সব সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন পর্যটন স্পট। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নাফ নদীর বুকে জেগে ওঠা জালিয়ার দ্বীপের ২৭১ একর ভূমির ওপর গড়ে উঠছে নাফ ট্যুরিজম পার্ক। ইতোমধ্যে ৪৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮০ কিলোমিটারের বিশ্বমানের সড়কটি মেরিন ড্রাইভ কলাতলী হয়ে সাগরের কূল ঘেঁষে সাবরাং অর্থনৈতিক অঞ্চলে সংযুক্ত হয়েছে।

করোনা মহামারির কারণে অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প খাতের মতো পর্যটনশিল্পও ঝুঁকির মুখে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ নির্দেশে সরকার করোনা-পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটনশিল্পকে গতিশীল করার জন্য এ খাতে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি পর্যটনের উন্নয়ন ও বিকাশেও মহাপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বেসামরিক বিমান, পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এ শিল্পের উন্নয়নে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০২৫ সালের মধ্যে পর্যটনশিল্পের সর্বোচ্চ বিকাশে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। এর অংশ হিসেবে দেশকে আটটি পর্যটন জোনে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি জোনে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রথমবারের মতো সরকারি-বেসরকারি যৌথ বিনিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে কক্সবাজারে পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণে ২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৭ হাজার কোটি টাকা। পরোক্ষভাবে বিনিয়োগ হবে ১ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা। এর বাইরে সরকারের গৃহীত প্রকল্পগুলো হলো– কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন, আধুনিক হোটেল-মোটেল নির্মাণ, মহেশখালীতে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, সোনাদিয়াকে বিশেষ পর্যটন এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা, ইনানী সৈকতের উন্নয়ন, টেকনাফের সাবরাংয়ে ইকো ট্যুরিজম পার্ক নির্মাণ, শ্যামলাপুর সৈকতের উন্নয়ন, ঝিলংঝা সৈকতের উন্নয়ন, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণ, কুতুবদিয়ায় বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্প্রসারণ, চকরিয়ায় মিনি সুন্দরবনে পর্যটকদের গমনের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডুলাহাজরা সাফারি পার্কের আধুনিকায়ন প্রভৃতি।

৩

পর্যটন খাত সংশ্লিষ্টদের মতে, পর্যটনের মেগা এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পর্যটকদের পদভারে মুখরিত হবে পুরো কক্সবাজার অঞ্চল। ২০১৮ সালে সরকার পর্যটনের ২৭টি স্থানকে চিহ্নিত করে ৪৮ কোটি ৮০ লাখ টাকা ব্যয়ে উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পন্ন করেছে। যার মধ্যে রয়েছে– মাধবকুণ্ড, রাতারগুল, মাধবপুর লেক, বিছানাকান্দি, পানাম নগর, ময়নামতি, নীলাচল, মেঘলা অবকাশ কেন্দ্র, বগুড়া মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, কক্সবাজার, সুসংদুর্গাপুর, বিজয়পুর, কুয়াকাটা, ষাটগম্বুজ মসজিদ, টেকের ঘাট, শ্রীমঙ্গল ও বাকের টিলাসহ অন্যান্য স্থান। এছাড়া পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে দেশের অন্তত ৩৬টি জেলার পর্যটন ব্র্যান্ডিং অনুসারে ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পর্যটন খাতের উদ্যোক্তারা মনে করছেন, পর্যটন খাতের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ এ খাতের অন্যান্য প্রতিকূলতা দূর করা গেলে বাংলাদেশ পর্যটনশিল্পে এশিয়ার রোল মডেল হয়ে উঠতে পারে। পর্যটনশিল্প বিকাশের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা সার্কভুক্ত অন্য দেশগুলোর তুলনায় আমাদের বেশি। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের বেশি আকর্ষণ করে। পর্যটনশিল্পের সব বাধা কাটিয়ে এই অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বড়ো খাত হয়ে উঠবে এটি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রতিবেশী ভারতসহ বিশ্বের অন্যান্য বহু দেশ পর্যটনের বিশ্ববাজারকে ধরতে একের পর এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর ফলে ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, চীন, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ পর্যটন খাত থেকে রাজস্ব আয় বহুগুণ বাড়িয়েছে।

তারা বলছেন, এশিয়ার কয়েকটি দেশ কেবল মাত্র পর্যটনশিল্পকে কেন্দ্র করে অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিগত অর্ধযুগেরও বেশি সময় ধরে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া তাদের পর্যটন দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। নেপালের জাতীয় আয়ের ৪০ শতাংশের জোগান দেয় দেশটির পর্যটন খাত। পর্যটন

খাতের সমীক্ষা মতে, জিডিপিতে পর্যটনশিল্পের অবদান সিংঙ্গাপুরে প্রায় ৭৫ শতাংশ। তাইওয়ান, হংকং, ফিলিপাইন ৫০ শতাংশের বেশি। মালদ্বীপের জিডিপির শতভাগ আসছে পর্যটন থেকে। ইন্দোনেশিয়া ও মেক্সিকোর মোট রপ্তানি আয়ের ৭০ শতাংশই পর্যটনে। এক সময় বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে ছিল। দিন বদলের পালায় সরকার এ খাতের গুরুত্ব বুঝতে পেরে নানা কার্যকর পদক্ষেপ, উদ্যোগ আর পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে যার ফলে পর্যটনশিল্প এখন আগের চেয়ে বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে।

৪

এখন এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিশ্বের দেশে দেশে পর্যটন খাতকে দেখা হয় আয়ের অন্যতম উৎস হিসেবে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৫০ সালে বিশ্বে পর্যটকের সংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র ২৫ মিলিয়ন তা ২০১৯ সালে এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২৩৫ মিলিয়নে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৫ সালে এর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় দুশো কোটি। ভ্রমণ সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিগত ৬৮ বছরে পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৫০ গুণ। ২০১৮ সালে বিশ্বের জিডিপিতে ট্যুরিজমের অবদান ছিল ১০.৪ শতাংশ। তারা মনে করছেন, ২০২৭ সালে তা গিয়ে দাঁড়াবে ১১.৭ শতাংশে। এছাড়া ২০১৮ সালে পর্যটকদের ভ্রমণ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৮৯৪.২ বিলিয়ন ডলার। আর একই বছর পর্যটনে বিনিয়োগ হয়েছে ৮৮২.৪ বিলিয়ন ডলার।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য মতে, ২০১৮ সালে বাংলাদেশে জিডিপি খাতে পর্যটনশিল্পের অবদান ছিল ৮৫০.৭ বিলিয়ন টাকা। এ

খাতে কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে ২৪ লাখ ৩২ হাজার। একই বছর পর্যটন খাতে বিনিয়োগ এসেছে ৪৩ বিলিয়ন টাকা। ২০১৯ সালে পর্যটনশিল্প বাংলাদেশের জিডিপিতে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ অর্থাৎ ৭৭ হাজার ৩০০ কোটি টাকার অবদান রেখেছে। পর্যটন রপ্তানির মাধ্যমে একই বছর ২ হাজার ৮০০ কোটি টাকার সমমানের বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে।

বিশেষজ্ঞরা তাদের অভিমত দিতে গিয়ে বলছেন, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রাচীনকাল থেকে পর্যটনের অপার সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। বর্তমানে প্রতিবছর কোটির ওপরে পর্যটক দেশের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে ভ্রমণ করেন।

পর্যটন নীতিমালার বিধি অনুসারে, ১৯৯১ সালে পর্যটনকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর সংশ্লিষ্টরা এ খাতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। তখন থেকে পর্যটনকেন্দ্রিক অর্থনীতি ও এর সম্ভাবনা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। পাশাপাশি এ খাতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। তবে পর্যটনশিল্পের বাস্তবায়নে নানাবিধ সমস্যা, প্রতিকূলতা আর অন্তরায়ের কারণে পর্যটনশিল্প দেশে যে প্রত্যাশিত সাফল্য পেতে পারত তা অর্জন করতে পারেনি।

দিন বদলের পালায় ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির দল আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে দীর্ঘ একুশ বছর পর ক্ষমতায় এলে পরিবর্তনের ছোয়া লাগতে শুরু করে সর্বত্র। সেই পরিবর্তনের ছোঁয়া এসে পড়েছে পর্যটনশিল্পেও। তিন মেয়াদে ক্ষমতায় থেকে সরকার দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করেছে। বর্তমানে সরকার দেশকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে স্মার্ট বাংলাদেশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সে অনুযায়ী সরকার নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

অর্থনীতি সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দ্রুত বদলে যাওয়া বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আর এক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পর্যটনশিল্প সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা বলছেন, সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের পর্যটনশিল্পের গুরুত্ব ও সফলতাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে এ খাতে কার্যকর পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এর ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের পর্যটন খাত আগের চেয়ে অনেক মজবুত অবস্থানে রয়েছে। এখাতে নতুন নতুন দিগন্ত ও সম্ভাবনা উন্মোচিত হচ্ছে, একইসঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করার ফলে এ খাত থেকে আয়ের পরিমাণও দিন দিন বাড়ছে। তারা মনে করছেন, সামনের দিনগুলোতে এই আয়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে।

৫

ভ্রমণসংশ্লিষ্ট অর্থনীতিবিদরা বলছেন, উপমহাদেশে বাংলাদেশের আঞ্চলিক অবস্থানগত দিক ও এর নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের কথা বিবেচনায় নিয়ে নতুন নতুন পর্যটন ভাবনা এ অঞ্চলকে গুরুত্বপূর্ণ করে গড়ে তোলার দাবি রাখে। বর্তমান সরকারের নেওয়া নানা কার্যকর পদক্ষেপ পর্যটনশিল্পকে দিন দিন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। গত দেড়-দু'দশক ধরে গ্রামীণ পর্যটনের বৈচিত্র্যময় অনুষঙ্গ পর্যটকদের আকৃষ্ট করেছে– তারা এখন চাকচিক্য জীবনের বাইরে এসে গ্রামীণ সরল সাদা জীবনের ছোঁয়া নিতে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছেন। গ্রামীণ পর্যটন নিয়ে অনেক উদ্যোক্তা এগিয়ে আসছেন– আর এক্ষেত্রে বিদেশিরা বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যময় গ্রামীণ জীবনের পাঁচালী দেখতে আসতে শুরু করেছে বাংলাদেশে। তারা বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা চিরায়ত গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থা, আচার- অনুষ্ঠান, লোকজ সংস্কৃতি, দেশীয় ঐতিহ্যময় খাবারদাবার, পুরোনো আমলের চাষাবাদ ব্যবস্থা তথা কৃষির নানা পদ্ধতি স্বচক্ষে দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে গ্রামীণ পর্যটনে অংশ নিচ্ছে। তারা ইউরোপ-আমেরিকার আলো ঝলমলে জীবন থেকে বাংলাদেশের নিভৃত গ্রামে এসে মাটির ঘরে থেকে আনন্দ পাচ্ছে– সকালবেলায় হাঁসমুরগির সুউচ্চ ডাক আর গাছগাছালির অলিন্দে অলিন্দে লুকিয়ে থাকা পাখপাখালির সুমধুর কলকাকলিতে বিস্ময়ে বিস্মিত হচ্ছে। শীতের সকালে তারা চোখের সামনে দেখছে কীভাবে খেজুর গাছ থেকে টাটকা রস সংগ্রহ করা হচ্ছে– তারা সেই রসকে অমৃত ভেবে খেয়ে আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে। অনেক বিদেশি পর্যটক গ্রাম বাংলার এই অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছেন। এছাড়া আমাদের দেশের আবহমান স্বকীয় কৃষি খামার, হেমন্তের ফসল কাটার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, ফসল তোলা আর ধানভানা কিংবা ঢেঁকিতে নারীদের গান গেয়ে গেয়ে ধানভানার দৃশ্য, দুপুরে রোদে বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ধান ওড়ানো, সেচ ব্যবস্থা– এসব দেখতে এখন ভিড় করছেন আগ্রহী পর্যটকরা।

পর্যটন সংশ্লিষ্টরা গ্রামীণ পর্যটনকে ফার্মিং ট্যুরিজম, ইকো ট্যুরিজম, গ্রিন ট্যুরিজম ভাগে ভাগ করেছে। বাংলার চোখ জুড়ানো গ্রামীণ খালবিল-হাওর, মিঠা পানির রংবেরঙের মাছ, জীববৈচিত্র্যে ভরপুর পশুপাখি আর এর আশপাশে ছড়িয়ে থাকা সুন্দরকে ঘিরে গড়ে তোলা হবে ইকোট্যুরিজম। গ্রিন ট্যুরিজম হতে পারে গ্রামীণ ট্যুরিজমের আরেকটি বড়ো সম্ভাবনা। এ দেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত– এই ছয় ঋতুর রাজসিক রূপ সৌন্দর্য বিদেশিদের মন প্রাণ ভরিয়ে দেবে– এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সংশ্লিষ্টদের মতে, দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে প্রাথমিকভাবে ঢাকার আশপাশের জেলাগুলোসহ ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, হালুয়াঘাট, সিলেট এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় গ্রামীণ পর্যটন নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করেছে সরকার।

সরকার ২০৩০ সাল নাগাদ যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য (এসডিজি) নিয়ে কাজ করছে গ্রামীণ পর্যটন তাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে তারা মনে করছেন।

পর্যটনশিল্পের সংশ্লিষ্টরা এ শিল্পের সম্ভাবনাকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে বলছেন, বর্তমান সরকারের হাতে পর্যটনশিল্প নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত, কুয়াকাটা, প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন ছাড়াও গ্রামীণ পর্যটনের ফার্মিং ট্যুরিজম, ইকো ট্যুরিজম, গ্রিন ট্যুরিজমসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত-অপ্রচলিত পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে আরও পর্যটনবান্ধব করে গড়ে তুলতে পারলে বাংলাদেশও হয়ে উঠতে পারে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আয়কারী দেশ।

মাহবুব রেজা: সাংবাদিক, athairidha15@yahoo.com

ছোট্ট রানি থেকে বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

বিনয় দত্ত

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে প্রীতিলতার ভূমিকা কী তা বলার আগে আন্দোলন সংগ্রামে তাঁর দৃপ্ত, আত্মপ্রত্যয়ী ভাবনার কথা বলি। '...স্বাধীনতার জন্য আমি প্রাণ দিতেও পারবো, প্রাণ নিতেও মোটেই কুণ্ঠাবোধ করবো না।' (*প্রীতিলতার আত্মকথা*, সম্পাদনা শেখ রফিক, প্রথম প্রকাশ: ১০ই ডিসেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা ১৬)

এভাবেই প্রীতিলতা স্বাধীনতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান জানিয়ে দেন। শুধু বড়োবেলায় নয়, ছোটোবেলা থেকেই প্রীতিলতা ছিলেন দেশের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কৌতূহলী।

প্রীতিলতা যখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, সবাই তাঁকে 'রানি' বলেই ডাকে। সেই সময় তাঁর মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা ভর করে। ঘটনাটা এরকম, ১৯২৪ সালের কথা। বিকেলবেলা প্রীতিলতার বড়োদা খুব উত্তেজনাপূর্ণ খবর নিয়ে আসেন। রেল শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য সতেরো হাজার টাকা ঘোড়ার গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গাড়িতে দুজন বন্দুকধারীও ছিল। বেলা এগারোটার দিকে টাইগার পাস এলাকায় দুজন পুলিশকে নিরস্ত্র করে চারজন পিস্তলধারী ডাকাত এসে সেই টাকার থলে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

কিছুদিন পর সেই চারজন ডাকাতের মধ্যে দুজন ধরা পড়ে। একজন চট্টগ্রাম শহরস্থ উমাতারা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাস্টারদা সূর্য সেন। অন্যজন অম্বিকা চক্রবর্তী, পোর্ট অফিসের কেরানি।

পরে জানা গেল লোকগুলো আসলে ডাকাত নয়, স্বদেশি। স্বদেশি আন্দোলনের কর্মী। (*প্রীতিলতার আত্মকথা*, সম্পাদনা শেখ রফিক, প্রথম প্রকাশ: ১০ই ডিসেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা ৯, ১০)

স্বদেশি আন্দোলন কী? এই আন্দোলন কাদের বিরুদ্ধে? কেন তাঁরা ডাকাতি করতে গেল? এই প্রশ্নগুলো ছোট্ট রানির মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। রানি কোনোভাবেই এর উত্তর মেলাতে পারেনি।

তখন রানি তার দাদার মাধ্যমে কিছু বই পায়। সেই সময় বইগুলো ছিল নিষিদ্ধ। কারও বাসায় এই ধরনের বই পাওয়া গেলে তাদের পুলিশ ধরে নিয়ে যেত। রানি সেই বইগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে পড়া শুরু করে। বইগুলোর মধ্যে ছিল ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, কানাইলাল, দেশের কথা ও সরকারি রাউলাট কমিশন ইত্যাদি। (*প্রীতিলতার আত্মকথা*, সম্পাদনা শেখ রফিক, প্রথম প্রকাশ: ১০ই ডিসেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা ১২)

বইগুলো রানির চোখ খুলে দেয়। ছোট্ট রানিকে দেশ সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। ব্রিটিশরা যে এই দেশের মানুষের ওপর অন্যায়ভাবে শোষণ-নিপীড়ন চালাচ্ছিল তা রানি বুঝে যায়। তখন থেকেই স্বদেশি হয়ে কাজ করার ইচ্ছে জাগে তাঁর মনে। কিন্তু মাস্টারদা তখনও অনুমতি দেয়নি। তবে রানির পরিবার ছিল দেশীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ। আরেক বিপ্লবী কল্পনা দত্তের সাথে আলাপকালে জানা যায় সেই বিষয়।

গল্প প্রসঙ্গে ওর মুখে শুনতাম, ওদের বাড়িতে কেউ বিলেতি জিনিস ব্যবহার করে না, ওরা সকলেই স্বদেশি জিনিস ব্যবহার করে। তাঁর কাছে মনে মনে ছোটো হয়ে যেতাম। আমাদের বাড়িতে কাপড়চোপড় থেকে আরম্ভ করে সবই বিলেতি। (*প্রীতিলতার আত্মকথা*, সম্পাদনা শেখ রফিক, প্রথম প্রকাশ: ১০ই ডিসেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা ৬৫)

এই বিলেতি জিনিস বর্জনের বিষয়টা ছিল দেশের প্রতি গভীর প্রেম। ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন। স্বদেশিদের দেশপ্রেম ছিল প্রগাঢ়। শুধু বিলেতি জিনিস বর্জনই নয়, প্রীতিলতা তাঁদের পরিবারের আর্থিক সংকটেও বাড়ি থেকে টাকা এনে দিত।

ঘটনাটা এ রকম, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন থেকে শুরু করে চাটগাঁয়ে সব আন্দোলনের সমস্ত খরচই দলের ছেলেমেয়েদের কাছ

থেকেই নেওয়া হতো। প্রত্যেক কর্মীই সাধ্যমতো টাকা বাড়ি থেকে এনে দলের কাজে দিয়েছে। প্রীতিলতার বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না। ওর বাবা ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির কেরানি, একার আয়ে গোটা সংসার চলে। মাইনে পেয়েই গোটা টাকা তুলে দেয় প্রীতিলতার হাতে। প্রীতিই সংসার সামলে নেয়। একদিন জরুরি কাজে মাস্টারদাকে ৫০০ টাকা পাঠাতে হবে। ৪৫০ টাকা জোগাড় হয়েছে। আরও ৫০ টাকা প্রয়োজন। প্রীতি সংসার খরচের গোটা ৫০ টাকা তুলে দেয়। (*প্রীতিলতার আত্মকথা*, সম্পাদনা শেখ রফিক, প্রথম প্রকাশ: ১০ই ডিসেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা ৬৮, ৬৯)

প্রীতিলতার এরকম আত্মনিবেদন ছিল দেশের প্রতি, স্বদেশিদের প্রতি, আন্দোলনের প্রতি। প্রীতিলতা শুধু নিষ্ঠাবান কর্মীই ছিলেন না, ভালো ছাত্রীও ছিলেন। কল্পনা দত্ত তাঁর লেখায় লেখেন এভাবে– প্রীতি শুধু স্কুল-কলেজের ভালো মেয়েই ছিল না, সে লিখতে পারত খুব ভালো, ভালো সাহিত্যিক ছিল। ইন্টারমিডিয়েটে ঢাকা বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে সে প্রথম হয়। পলাতক জীবনে সে যা লিখত সকলে তা আওড়াতো কথায় কথায়। (*প্রীতিলতার আত্মকথা*, সম্পাদনা শেখ রফিক, প্রথম প্রকাশ: ১০ই ডিসেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা ৬৯)

এ রকম মেধাবী একজন হাসতে হাসতে নিজের জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীনতার জন্য। বীরেশ্বর রায় লেখেন এইভাবে– ২৪শে সেপ্টেম্বর পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের দিন। জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে করা হয় এই পরিকল্পনা। মাস্টারদা তখন ধীরভাবে জানালেন যে সেদিনের অভিযানের নেত্রী হবেন প্রীতিলতা। আক্রমণের ছক বুঝিয়ে দিলেন। বিলিয়ার্ড হলের দিকে থাকবে বীরেশ্বর রায়, প্রফুল্ল দাশ ও পান্না সেন। ক্লাববাড়ির হলঘর আক্রমণে থাকবে প্রীতিলতা স্বয়ং আর সঙ্গে থাকবে কালীকিঙ্কর দে ও শান্তি চক্রবর্তী। আর সামনের দিকে যে দরজা ও জানালা সেগুলো আগলে থাকবেন সুশীল দে ও দীনেশ চক্রবর্তী। আক্রমণকারীর সংখ্যা এবার বেড়ে হয়েছে আটজন।

... ক্লাবঘর থেকে বিপ্লবী বন্ধু আক্রমণের নিশানা দেখাল। নেত্রী প্রীতিলতা নির্দেশ দিলেন আক্রমণের। বিপ্লবী ভাইরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্লাবঘরের ওপর। ঘন ঘন গুলি ও বোমার আওয়াজে চত্বরটি কেঁপে উঠল। সাহেবদের নাচের আসরকে, গানের জলসাকে শ্মশানে পরিণত করে দিয়ে বিপ্লবীরা ফিরে এসেছিল। ফেরেনি শুধু একজন। সেদিনকার দুঃসাহসী অভিযানের নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। প্রীতিলতার দেহ ক্লাবগেটের বাইরে পড়ে রইল, তিনি স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপ করেছিলেন। ... মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে প্রীতিলতা অন্যান্য বন্ধুদের দ্রুত চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে যান। (*প্রীতিলতার আত্মকথা*, সম্পাদনা শেখ রফিক, প্রথম প্রকাশ: ১০ই ডিসেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা ৬০, ৬১)

এভাবেই প্রীতিলতা দেশের জন্য নিজের আত্মত্যাগের মাধ্যমে বেঁচে আছেন যুগের পর যুগ। এই সময়ের শিশু থেকে তরুণ সবার প্রীতিলতা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন, পাঠ্যবই থেকে গল্প-উপন্যাসে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সম্পর্কে জানা উচিত, তাঁর সম্পর্কে জানানো উচিত। কল্পনা দত্ত লিখেছিলেন, প্রীতিলতার বাবা জগদ্বন্ধুবাবু যখন রাস্তা দিয়ে যান, অপরিচিতের কাছে তাঁকে সবাই পরিচয় করিয়ে দেয়, 'প্রথমে যে মেয়ে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, উনি তাঁরই বাবা।'

কল্পনা দত্তের এই কথা হৃদয়ে বাজে, কতটা সাহসী যে বীরকন্যা প্রীতিলতা ছিলেন এই ছোটো লেখায় পুরোটা তুলে ধরা অসম্ভব। তাই গল্প, কবিতা, উপন্যাস, চলচ্চিত্রে প্রীতিলতার কথা আমাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা উচিত, উল্লেখ করা উচিত। এতে তাঁর প্রতি কিছুটা ঋণ স্বীকার করা হবে।

বিনয় দত্ত: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক, benoydutta.writer@gmail.com

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার উদ্বোধন

দেশের ১৮ বছরের উর্ধ্বের সকলকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই আগস্ট তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিকভাবে পেনশন স্কিম– প্রগতি, সুরক্ষা, সমতা এবং প্রবাসী উদ্বোধন করেন।

স্কিমটি চালু করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেন,'আমরা শোকের মাসে সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করলাম। প্রাথমিকভাবে ছয়টির মধ্যে চারটি স্কিম ১৭ই জুলাই উদ্বোধন করা হলো। অন্য দুটি স্কিম পরে চালু করা হবে।'

তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেহেশত থেকে দেখে খুশি হবেন যে, সরকার তার জনগণকে একটি সুন্দর ও উন্নত জীবন দেওয়ার চেষ্টা করছে, যার জন্য তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা ও সুবিধাভোগীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন এবং তিনটি জেলা– গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও রংপুর এবং সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশের কনস্যুলেট জেনারেল একটি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ইভেন্টের সাথে যুক্ত হয়।

প্রগতি স্কিমটি বেসরকারি খাতের চাকরিজীবীদের জন্য, স্বকর্মে নিযুক্ত লোকদের জন্য সুরক্ষা, প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য প্রবাসী এবং দেশের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সমতা প্রযোজ্য হবে। সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মূল লক্ষ্য দেশের ১৮ বছরের বেশি বয়সি সকলকে এর আওতায় আনা এবং তারা তাদের ৬০ বছর বয়স হওয়ার পরে আজীবন পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন। পেনশন ব্যবস্থার বয়সসীমা প্রাথমিকভাবে ৫০ বছর নির্ধারণ করা হয়েছিল যা পরে সংশোধন করা হয়। ৫০ বছরের বেশি বয়সিরাও টানা ১০ বছর ধরে কিস্তি পরিশোধের পর পেনশন সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার ওপর একটি ভিডিও প্রামাণ্যচিত্রও দেখানো হয়।

প্রতিবেদন: মুবিন হক

স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নারীরা

আফরোজা নাইচ রিমা

স্মার্ট বাংলাদেশ হবে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সোসাইটির ওপর ভিত্তি করে। আর সমাজ উন্নয়ন নির্ভর করে পুরো জনসংখ্যার ওপরে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী, দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৮ কোটি ১৭ লাখ ১২ হাজার ৮২৪ জন; নারী ৮ কোটি ৩৩ লাখ ৪৭ হাজার ২০৬ জন। এই হিসাবে বর্তমানে প্রতি ১০০ জন নারীর বিপরীতে পুরুষ আছেন ৯৮.০৪ জন। সাশ্রয়ী, টেকসই ও জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে 'প্রগতিশীল প্রযুক্তি, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতিতে অবশ্যই নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণের কারণে বাংলাদেশে জেন্ডার সমতাসহ সব ক্ষেত্রেই উন্নতি হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে লিঙ্গ সমতায় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে নারীর অনেক ভূমিকা রয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে নারীর অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে হলে নারীদের প্রযুক্তি শিক্ষার হার বাড়াতে হবে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে পড়াশোনার জন্য বিভিন্ন সুযোগ দিতে হবে। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, বর্তমানে মাত্র ৩০ শতাংশ নারী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে পড়াশোনা করেন। আর দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের পেশাজীবীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র ১২ শতাংশ। স্মার্ট বাংলাদেশের নারীরা এখন অনেক এগিয়ে গেছে। তারা এখন গ্রামে বসে মোবাইলের সাহায্যে অনলাইনে ব্যাবসা করছে। বিকাশে টাকা লেনদেন করছে। মেয়েরা অনলাইনে ক্লাস করছে।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামেও বর্তমানে ডিজিটাল সেন্টার থেকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ডিজিটাল সেন্টার থেকে দেশের নাগরিকরা ৮০ কোটির বেশি সেবা গ্রহণ করেছে। বিশ্বে অনলাইন শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান এখন দ্বিতীয়। প্রায় সাড়ে ছয় লাখ প্রশিক্ষিত ফ্রিল্যান্সার আউটসোর্সিং খাত থেকে অন্তত পক্ষে পাঁচশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করছে। মাত্র ১৩ বছরে ৬৫ লাখ থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখন ১৩ কোটির বেশি এবং মোবাইল সংযোগের সংখ্যা ১৮ কোটির ওপরে।

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৮ হাজার ৮০০টির বেশি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এসব সেন্টার থেকে প্রতি মাসে গড়ে ৭০ লাখেরও অধিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত দেশের নাগরিকরা ৮০ কোটির বেশি সেবা নিয়েছেন। এতে নাগরিকদের ৭৮.১৪ শতাংশ কর্মঘণ্টা, ১৬.৫৫ শতাংশ ব্যয় এবং ১৭.৪ শতাংশ যাতায়াত সাশ্রয় সম্ভব হয়েছে। এছাড়া পেপারলেস কমিউনিকেশন চালু করার লক্ষ্যে ই-নথির মাধ্যমে ২ কোটি ৪ লাখের বেশি ফাইলের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ই-নামজারি সিস্টেমের মাধ্যমে ৪৫.৬৮ লাখের বেশি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে অনলাইনে।

এ ধরনের নানান সুবিধা পাওয়ায় দেশে স্টার্টআপ ইকো সিস্টেম গড়ে উঠেছে। প্রায় আড়াই হাজার স্টার্টআপ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে, যারা প্রায় আরও ১৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। মাত্র সাত বছরে এ খাতে সাতশো মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এসেছে।

তেরো বছর আগে ডিজিটাল অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন ডলার। আর বর্তমানে তা ১.০৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। সরকারের লক্ষ্য ২০২৫ সালে আইসিটি রপ্তানি ৫ বিলিয়ন ডলার এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইসিটি খাতে কর্মসংস্থান ৩০ লাখে উন্নীত করা।

আইসিটি পার্কে দেশি-বিদেশি ১৯২টি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে। ২০২৫ সালের মধ্যে আরও ৩৫ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে।

জরুরি সেবার মাধ্যমে সুবিধা পাচ্ছে জনগণ। জরুরি সেবা ৯৯৯, সরকারি তথ্য ও সেবা ৩৩৩, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ১০৯, দুদক ১০৬, দুর্যোগের আগাম বার্তা ১০৯০– লক্ষ্য এবার স্মার্ট বাংলাদেশ।

দেশে ই-কমার্সের ৮০ ভাগ ব্যাবসা পরিচালনা করছেন নারীরা। ফ্রিল্যান্সিংয়ে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। নারীর শান্তি ও নিরাপত্তা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ১,৩২৫ নম্বর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে– যা নারীর শান্তি ও নিরাপত্তা-ডব্লিউপিএস এজেন্ডা প্রতিষ্ঠা করেছে।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে।

সংবিধানের ২৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: রাষ্ট্র শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করবে না। অথচ একই অনুচ্ছেদের (২) ধারায় বলা হয়েছে: নারীদের সমান অধিকার থাকবে রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে। সরকার নারী নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে এবং নীতিমালায় নারীর সামগ্রিক উন্নয়ন ও মূলধারার আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং তাদের ক্ষমতায়নের পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, ব্যাবসা, খেলাধুলা, সশস্ত্রবাহিনী প্রভৃতি খাতে তাদের বর্ধিত অংশগ্রহণ ও অবদান বাংলাদেশের আর্থসামাজিক দৃশ্যপটকে বদলে দিয়েছে। বাংলাদেশে নারীরা এখন সরকারের সচিব, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং অনেক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে দায়িত্ব পালন করছেন।

গ্রামীণ জীবনেও আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে প্রতিটি ইউনিয়নে চালু করা হয়েছে ডিজিটাল সেন্টার। এই আমূল পরিবর্তনের সারথি হয়ে দেশের নাগরিকদের নিরলস সেবা দিয়ে যাচ্ছেন নারী উদ্যোক্তারা। যারা সংখ্যায় দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে নারী উদ্যোক্তারা ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছেন। নাগরিকদের সেবা প্রদান, তাদের জীবনমান উন্নয়ন করার পাশাপাশি আর্থিকভাবেও স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে এই সকল নারী উদ্যোক্তারা। সেই সাথে তারা প্রান্তিক অঞ্চলে নতুন নতুন উদ্যোক্তাও সৃষ্টি করছেন।

ডিজিটালাইজেশন হওয়ার পরে বিগত বছরগুলোয় বাংলাদেশে নাগরিকের ব্যাংকিং সেবায় অন্তর্ভুক্তি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালে যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার মাত্র ৩১ শতাংশ আর্থিক পরিষেবার আওতায় ছিল, সেটা গত এক দশকেরও কম সময়ে ৫৩ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই বৃদ্ধির হার ক্রমবর্ধমান। ফিন-টেক (ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি)-এর মতো আর্থিক পরিষেবার ডিজিটাল সেন্টারগুলোয় অন্তর্ভুক্তি নাগরিকের হয়রানি হ্রাস করছে, তাদের সেবা প্রাপ্তিকে করেছে আরও ত্বরান্বিত, আরও সহজ। মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS)-এর মতো পরিষেবামূলক ব্যবস্থার ফলে ব্যাংকিং সেবা এখন পৌঁছে যাচ্ছে নাগরিকের দোরগোড়ায়। সামগ্রিকভাবে এই ডিজিটালাইজেশন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য রাখছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে নারীরা। নারীর এই এগিয়ে যাওয়াই দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির এক অপ্রতিরোধ্য যাত্রা। তাদের অগ্রযাত্রার ফলেই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৭ম। স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত কর্মীদের প্রায় ৭০ শতাংশই নারী। করোনা মহামারির বিরুদ্ধে লড়াইয়েও তারা ছিলেন সম্মুখ সারির যোদ্ধা। তৈরি পোশাক আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, সেখানেও ৮০ শতাংশের বেশি নারী কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত এই সকল নারীদের প্রতিটি বুননে ফুটে উঠেছে আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশের অবয়ব এবং নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এই অংশগ্রহণমূলক ধারাবাহিকতায় রচিত হবে আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।

আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, সোনালি সাহিত্যভিত্তিক ও উদ্ভাবনী বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বাধীনভাবে সংস্কৃতিচর্চা ও বিকাশের সুযোগ দানে নারী এবং পুরুষকে একযোগে কাজ করতে হবে। শুধু অর্থনীতিই একটি দেশ বা জাতির উন্নয়নের সূচক হতে পারে না, এর পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের সূচকও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, চিত্রকর, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন পেশাজীবীদেরকে স্বাভাবিক নিয়মে শিল্পচর্চায় এবং যার যার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। নতুন নতুন চিন্তাভাবনা, ধারণার উন্মেষের ফলেই সম্ভব হবে স্মার্ট মানুষ, স্মার্ট পরিবার এবং স্মার্ট সমাজ– সর্বোপরি স্মার্ট বাংলাদেশ।

আফরোজা নাইচ রিমা: উপ-প্রকল্প পরিচালক, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, nice_du@yahoo.com

বঙ্গবন্ধুর 'বায়োপিক' পেল সেন্সর সনদ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড ৩১শে জুলাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত *মুজিব: একটি জাতির রূপকার (Mujib: The making of a Nation)* চলচ্চিত্র সেন্সর সনদ প্রদান করে। ভারতের শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত এবং অতুল তিওয়ারি ও শামা জায়দি'র ইংরেজি চিত্রনাট্য থেকে আসাদুজ্জামান নূরের তত্ত্বাবধানে বাংলায় রূপায়িত এ ঐতিহাসিক সিনেমায় প্রায় দেড়শো চরিত্রের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে আরেফিন শুভ ও শতাধিক বাংলাদেশি শিল্পী অভিনয় করেছেন। বাংলাদেশের ৬০ ভাগ ও ভারতের ৪০ ভাগ ব্যয়ে নির্মিত এ বায়োপিকের শুটিং ২০২১ সালের ২২শে জানুয়ারি ভারতের মুম্বাই ফিল্ম সিটিতে শুরু হয়ে সে বছরের ১৮ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে শেষ হয়। গত বছর ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে চলচ্চিত্রটির প্রথম পোস্টার, ৩রা মে দ্বিতীয় পোস্টার ও ১৯শে মে ফ্রান্সের কান চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটির ট্রেইলার রিলিজ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন : ফায়ান হাসান

বাংলাদেশে পর্যটন উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রাচ্য পলাশ

অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত বদ্বীপ হিসেবে খ্যাত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। বিশ্বে প্রায় দুর্লভ ষড়ঋতুর এ দেশকে পৃথিবীর অন্যতম পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করার লক্ষ্যে পর্যটন উন্নয়ন, সুবিধাদি সৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির আদেশ ১৪৩ বলে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সেবা প্রদান, দেশের পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার সরকার ২০১৬ সালকে 'পর্যটন বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন 'পর্যটন বর্ষ উপলক্ষে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকার পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়ন'– শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু হয় ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে।

এ প্রকল্পের অধীনে গাজীপুরের সালনায় ছয়টি আধুনিক কটেজ, আধুনিক স্থাপত্য নকশায় ৬০ আসন বিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ভবন ও রিসিপশন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে রয়েছে– অভ্যর্থনা কাউন্টার, মিটিংরুম, তিনটি স্যুভিনর শপ, ক্যান্টিন ও কফি কর্নার। এছাড়া রয়েছে– দুটি পিকনিক শেড, কুকিং সুবিধা, শিশুদের জন্য রাইড ও বিনোদন সুবিধা। একই প্রকল্পের অধীনে সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যমুনা নদীর তীরে 'যমুনা পর্যটন কেন্দ্র' গড়ে তোলা হয়েছে। এ কেন্দ্রে রয়েছে– আবাসিক ভবন, রেস্তোরাঁ, পিকনিক শেড, সুপ্রশস্ত উন্মুক্ত চত্বর, বাগান ও শিশু বিনোদনের ব্যবস্থা।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ জ্যোতি বসু'র পৈতৃক নিবাস নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁওয়ের বারদি গ্রামে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণে ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০১৯ সালে সোনারগাঁওয়ের বারদি গ্রামে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ শুরু হয়। এ পর্যটন কেন্দ্রে রয়েছে– আবাসিক ভবন, রেস্তোরাঁ, পিকনিক শেড, সুপ্রশস্ত উন্মুক্ত চত্বর, বাগান ও শিশু বিনোদনের ব্যবস্থা।

বাগেরহাটে হযরত শাহজাহান আলী (র.)'র দরগা শরিফের গেটে এবং বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদের অদূরে ছয়তলা বিশিষ্ট পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ চলমান রয়েছে। এ পর্যটন কেন্দ্রে রয়েছে– আবাসিক ভবন, রেস্তোরাঁ, বারবিকিউ স্ন্যাকস শপ।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পাঁচটি জেলায় পর্যটন সেবা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। স্থাপনকৃত সেবা কেন্দ্রগুলোতে পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক ওয়াসরুম, চেঞ্জিংরুম, সিটিং সুবিধা ও স্ন্যাকস শপ রয়েছে। পাঁচটি সেবা কেন্দ্র হচ্ছে– নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বিজয়পুরে বিরিশিরি সাদামাটি পাহাড় এলাকা, শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলার গজনী অবকাশ কেন্দ্র, নাটোর জেলার রানি ভবানী রাজবাড়ি এলাকা, সিলেট জেলার জৈন্তাপুরের লালাখাল এলাকায় এবং কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার জোড়কানন দিঘি এলাকায়।

পর্যটন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

'পর্যটন বর্ষ উপলক্ষে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়ন' প্রকল্পের অধীনে ২০১৮ সালে পর্যটকদের প্যাকেজ ট্যুর পরিচালনার জন্য চারটি মাইক্রোবাস ও চারটি ট্যুরিস্ট কোস্টার ক্রয় করা হয়েছে। এ ট্যুরিস্ট বাস দিয়ে সম্প্রতি পদ্মা সেতু, টুঙ্গিপাড়াস্থ বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ এলাকায় প্যাকেজ ট্যুর পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পরিচালিত এ প্যাকেজ ট্যুরগুলো দেশের পর্যটকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পায়। অদূর ভবিষ্যতে কুয়াকাটাসহ দেশের অন্যান্য পর্যটন গন্তব্যে প্যাকেজ ট্যুর পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে।

এ প্রকল্পের অধীনে রাঙামাটিতে পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স-এর আবাসিক ভবন ও কটেজ, বান্দরবান পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ি পর্যটন মোটেল সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী পর্যটন মোটেল এবং কুয়াকাটা পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স-এর হোটেল ও ইয়ুথ ইন সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে কক্সবাজার এবং কুয়াকাটায় চেঞ্জিং ক্লোশেড, স্যুভিনর শপ নির্মাণ করা হয়েছে।

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনা করা হয়। ২০১৭-২০২০ মেয়াদে হোটেল অবকাশে তিনটি পৃথক আধুনিক কিচেন নির্মাণ, রেস্তোরাঁ, কফি শপ, ব্যাঙ্কুইট, কনফারেন্স হল, লন্ড্রি, বেকারি, আবাসিক কক্ষ সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। আবাসিক ভবনে নতুন লিফট সংযোজন করা হয়েছে।

সদ্য স্বাধীন দেশে গঠিত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের দীর্ঘদিন নিজস্ব ভবন ছিল না। এ শূন্যতা দূরীকরণে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় পর্যটন ভবন নির্মাণ অনুমোদন পায়। ২০১৭-২০২০ মেয়াদে শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকায় আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ১৩ তলাবিশিষ্ট পর্যটন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। পর্যটন ভবনে রুফটপ রেস্টুরেন্ট চালু করা হয়েছে। অত্যাধুনিক এ রুফটপ রেস্টুরেন্টটি আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র আওতায় দেশে পর্যটন সুবিধা উন্নয়নে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে:

ক) প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত চট্টগ্রামস্থ পারকিতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্পটি চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার পারকি

সমুদ্রসৈকতে নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ১৩.৩৬ একর জমির ওপর একাধিক সিঙ্গেল কটেজ ও ডুপ্লেক্স কটেজ, সার্ভিস ব্লক, মাল্টিপারপাস হলসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দ্বিতীয় মহানন্দা শেখ হাসিনা সেতু সংলগ্ন এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত একটি প্রকল্প। ৪৪.৫১ একর জমিতে আবাসিক ভবন, কটেজ, রেস্তোরাঁ ও বিনোদনের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে। প্রকল্পের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে আমের রাজধানীখ্যাত চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন সুমিষ্ট জাতের আমের বাগান থাকবে।

এছাড়াও করপোরেশনের হোটেল-মোটেলগুলোতে শাইনেস, সিসিটিভি ক্যামেরা ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ইনস্টিটিউট-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ক্লাসরুম সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ল্যাব নির্মাণ, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ল্যাপটপ ক্রয়, বারিস্তা কিচেন ল্যাব নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের হোটেল অবকাশ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাসভবন 'গণভবন', পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, একনেক সভা, মন্ত্রিপরিষদ সভা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর,

গ) নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় হাতিয়া উপজেলার চর ওসমানে ১৬.৬৫ একর এবং নিঝুম দ্বীপের চর নিজামে প্রায় ১৫.০০ একর জমিতে পৃথক পৃথক কটেজ, রেস্তোরাঁসহ বিভিন্ন পর্যটন সুবিধা নির্মাণাধীন রয়েছে।

ঘ) বরিশাল জেলার দুর্গাসাগর এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন প্রকল্পের অধীনে দুর্গাসাগর দিঘি এলাকায় আবাসিক ভবন, রেস্তোরাঁ, পিকনিক শেড, শপিং কর্নার ও ওয়াটার রাইডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ঙ) কক্সবাজারস্থ খুরুশকুলে শেখ হাসিনা টাওয়ারসহ পর্যটন জোন নির্মাণকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা: এ পর্যটন জোন নির্মাণের লক্ষ্যে ৯৫ একর জমিতে প্রকল্পের মাস্টারপ্ল্যান তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের মাস্টারপ্ল্যান এবং প্রকল্প প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে এখানে আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ করা হবে।

চ) নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার আদর্শনগরে হাওরভিত্তিক পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে আবাসিক ভবন, রেস্তোরাঁ ও অন্যান্য সুবিধাদির নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

ছ) পঞ্চগড় জেলা শহরে আকর্ষণীয় স্থাপত্য নকশায় আবাসিক ভবন, রেস্তোরাঁ, সুইমিংপুলসহ পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে।

জ) দেশের ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানে ট্যুর পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিকমানের দ্বিতল বিশিষ্ট ছয়টি ট্যুরিস্ট কোচ ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এশিয়ার একটি অন্যতম চাহিদাসম্পন্ন পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যটন খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। অচিরেই বাংলাদেশ এর সুফল ভোগ করবে।

প্রাচ্য পলাশ: চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রাবন্ধিক, prakrita2015@gmail.com

‘তথ্য কমিশন ভবন’-এর উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে আগস্ট গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ১৩ তলাবিশিষ্ট তথ্য কমিশন ভবন উদ্বোধন করেন। ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তথ্য কমিশন প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক, সাবেক তিন প্রধান তথ্য কমিশনার, দুই তথ্য কমিশনার এবং কমিশন সচিব জুবাইদা নাসরীনসহ আমন্ত্রিত অতিথিগণ।

নবনির্মিত তথ্য কমিশন ভবনটিতে রয়েছে ৭ হাজার ৮৬৬ দশমিক ৪০ বর্গমিটার ফ্লোর স্পেস, এজলাস কক্ষ, ৩০০ আসন বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়াম, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থানের জন্য ডরমেটরি, বনায়ন স্পেস, আধুনিক ফায়ার প্রটেকশন সুবিধা, ১৩ স্টপ প্যাসেঞ্জার লিফট, ৩ স্টপ কার লিফট, কার পার্কিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ১২৫০ কেভিএ সাব স্টেশন ও ৪০০ কেভিএ জেনারেটর, নিজস্ব পাম্প হাউজ এবং ডিপ টিউবওয়েল, ডিজিটাল লাইব্রেরি, ক্যাফেটেরিয়া, ডে-কেয়ার সেন্টার, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা এবং সার্বক্ষণিক ওয়াই-ফাইসহ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সুবিধা।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে তথ্য কমিশন গঠনের পর অস্থায়ী অফিসেই কমিশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল। ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেন এবং আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় শূন্য দশমিক ৩৫ একর জমি বরাদ্দ দেন। ২০১৯ সালের ২৪শে এপ্রিল ৭৫ কোটি ৪ লাখ ৫৮ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে তথ্য কমিশন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণকাজ শুরু হয়। ভবনটি নির্মাণের ফলে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য কমিশন সুন্দর ও মনোরম কর্মপরিবেশে জনগণকে সর্বোচ্চ সেবা দিতে পারবে।

প্রতিবেদন: আহনাফ হোসেন

সারা দেশে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ, সতর্কতা জরুরি

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা এ পর্যন্ত হাজারো জন ছাড়িয়েছে। এছাড়া এ বছর দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে এক লাখের বেশি মানুষ। তাদের মধ্যে ঢাকার বাসিন্দা তুলনামূলক বেশি হলেও ঢাকার বাইরেও এ বছর অনেক রোগী পাওয়া যাচ্ছে। এর আগে ২০২২ সালে ডেঙ্গুতে ২৮১ জন মারা যান। একই বছরে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ৬২ হাজার ৩৮২ জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গত বছরের তুলনায় এ বছর আক্রান্ত ও মৃত্যু উভয়েই প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। এর একটি কারণ হতে পারে এ বছর অনেক রোগীই হঠাৎ করে ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার বা শকে আক্রান্ত হচ্ছেন খুব বেশি উপসর্গ প্রদর্শন না করেই। এজন্য ডেঙ্গু মোকাবিলায় মশক নিধন, মশার প্রজননক্ষেত্র ধ্বংসসহ নানাবিধ কর্মসূচির পাশাপাশি এখন আমাদের সময় সচেতনতার, না হলে চরম বিপর্যয়ে পড়বে আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা।

ডেঙ্গু জ্বরের জন্য দায়ী ফ্ল্যাভিভাইরাসের অন্তর্ভুক্ত ডেঙ্গু ভাইরাস বা ডেঙ্গি ভাইরাস। এডিস মশা ডেঙ্গু ভাইরাসসহ ইয়েলো ফিভার ভাইরাস, জিকা ভাইরাস, চিকুনগুনিয়া ভাইরাসেরও বাহক। এই ভাইরাসের ৪টি সেরোটাইপ পাওয়া গিয়েছে, যাদের প্রত্যেকেই রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। জীবাণুবাহী এডিস মশা কাউকে

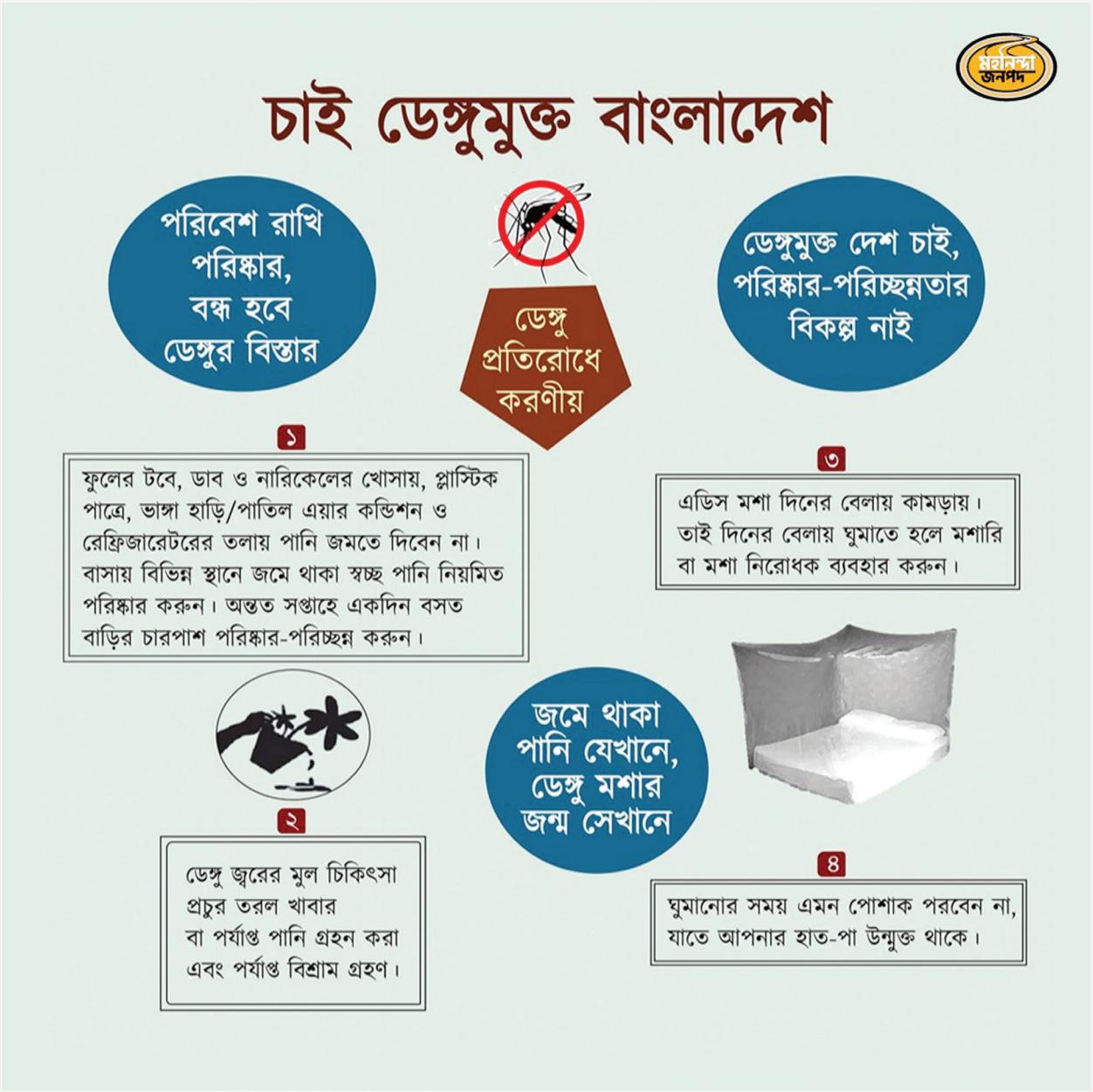

কামড়ালে সেই ব্যক্তি ৪ থেকে ৬ দিনের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হতে পারে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে যদি কোনো জীবাণুবিহীন এডিস মশা কামড়ায় তাহলে সেই মশা ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এই জীবাণুবাহী মশাটি যখন অপর কোনো ব্যক্তিকে কামড়ায় তখন তার দেহে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে খুব সহজে একজন থেকে অপরের দেহে এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। তিন ধরনের ডেঙ্গু হতে দেখা যায়– ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু ফিভার, ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার ও ডেঙ্গু শক সিনড্রোম।

সাধারণত ভাইরাস জ্বরের যে লক্ষণ তার সবই ডেঙ্গু জ্বরে থাকে। ডেঙ্গু জ্বরের প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে– সারা শরীরের মাংসপেশিতে বিশেষ করে হাড়, কোমর, পিঠসহ অস্থিসন্ধিতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। ব্যথা, জ্বর হওয়ার ৪ বা ৫ দিনের সময়ে এলার্জি বা ঘামাচির মতো সারা শরীরজুড়ে লালচে দানা দেখা যায়। এ জ্বর কম বা বেশি উভয়ই হতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। খাবারে অরুচি ও বমি বমি ভাব হয়। সাধারণত জ্বর ৩-৪ দিন পর ভালো হয়ে যায়, তবে রক্তের প্লেটলেট কমতে থাকে। কখনও মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে আবার জ্বর আসে এবং শরীরে র‍্যাশ দেখা যায়। কারও কারও ক্ষেত্রে প্রচণ্ড মাথাব্যথার সঙ্গে শরীরেও প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয় এবং জ্বর থাকে। কখনও চোখের পেছনে ব্যথা অনুভব করে। যাদের বেশি জ্বর থাকে তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে, যেমন– চামড়ার নীচ, নাক, মুখ, দাঁত ও মাড়ি, চোখের মধ্যে এবং চোখের বাহিরে, কফ, বমি ও পায়খানার সঙ্গে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়। কারও কারও ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট হতে পারে আবার রোগীর রক্তনালী থেকে প্লাজমা লিকেজের কারণে বুকে ও পেটে পানি জমতে পারে। পানিশূন্যতা বেশি হওয়ায় প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যেতে পারে, অনেক সময় লিভার আক্রান্ত হয়ে রোগীর জন্ডিস, কিডনিতে আক্রান্ত হয়ে রেনাল ফেইলিউর ইত্যাদি জটিলতা দেখা দিতে পারে। এজন্য প্রতিদিন কিছু টেস্ট করে দেখতে হয় কোনো জটিলতা তৈরি হচ্ছে কি না।

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার লক্ষণ প্রায় কাছাকাছি হলেও কিছু পার্থক্য আছে। চিকুনগুনিয়াতে র‍্যাশ সাধারণত ১-২ দিনেই দেখা যায়। এখানে মাংসপেশি বা পিঠ ব্যথার তুলনায় অস্থিসন্ধি, হাতের আঙ্গুল এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাথা বেশি অনুভূত হয়। তবে চোখের পেছনে ব্যথা, রক্তক্ষরণ, প্লেটলেট কমে যাওয়া, শক এগুলো হয় না বললেই চলে। চিকুনগুনিয়া সাধারণত দ্বিতীয়বার হয় না, তবে ডেঙ্গু দ্বিতীয় বার হলে জটিলতা আরও বেড়ে যায় বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। সাধারণত বর্ষাকালে শহর এলাকায় ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ লক্ষ করা যায়।

খুবই সাধারণ কিছু নিয়মকানুন যা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সবসময় সকলের সচেতনতার জন্য সরকার কর্তৃক প্রচার করে, সেগুলো মেনে চললে আমরা ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি। আক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়াসহ নতুনভাবে এ রোগের জীবাণুবাহী মশার আরও প্রসার না ঘটে সেজন্য সকলকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাসার পাশে, ছাদে, পরিত্যক্ত জিনিসের ভেতর, ফুলের টব, এয়ার কন্ডিশনার, ফ্রিজ, বাথরুম ইত্যাদি জায়গায় যেন পানি না জমে থাকে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। অন্তত ৩ দিনে ১ বার এসব জায়গা পরিষ্কার করতে হবে। সরকার এবং সিটি করপোরেশন ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশক নিধন অভিযান পরিচালনা করছে। এছাড়া জলাশয়, নর্দমা, রাস্তার পাশের গর্ত এগুলোও পরিষ্কার করছে। তবে আমাদের সকলকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে। বাসাবাড়ি এবং উল্লিখিত স্থানসমূহও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এডিস মশা সকালে ও সন্ধ্যায় বেশি কামড়ায়, তাই এ সকল সময়ে বেশি সচেতনতা প্রয়োজন। ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসার প্রয়োজনে মৃদু, মাঝারি, তীব্র– এ রকম ভাগে ভাগ করা হয়। মৃদু রোগীরা বাসায় থেকেই চিকিৎসা নিতে পারে, আর রক্তের পরীক্ষা করে ফলোআপে আসতে পারে। এতে করে হাসপাতালে রোগীর চাপ কমবে। বাসায় থেকে প্যারাসিটামল ও ওরস্যালাইন খাওয়া যেতে পারে। পানি বা তরল জাতীয় খাবার বেশি খেতে হবে। জ্বরের সাথে যাদের অন্যান্য সমস্যা থাকে বা রক্তের টেস্টে প্লাজমা লিকেজ পাওয়া যায়, তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে শিরাপথে স্যালাইনসহ নানাবিধ চিকিৎসা দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তবে রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। সর্বোপরি সকল শিক্ষিত জনসাধারণ আমরা কমবেশি সবাই এ বিষয়ে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই রাজধানীবাসীসহ সকলে এ রোগ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে।

করোনা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বর্ষাকাল এবং এর পরবর্তী সময়ে ডেঙ্গুর বিষয়ে সতর্ক না থাকলে তা আমাদের জন্য বিশাল বিপদ ডেকে আনতে পারে। ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগ না থাকলে শুধু সরকারের চেষ্টায় ডেঙ্গু মোকাবিলা সম্ভব হবে না। তাই সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই।

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী: চিকিৎসক, jafri.mhasan@gmail.com

ছেলে বা মেয়ে নয় সন্তানই হোক পরিচয়

জেসমিন বন্যা

একটা শিশু জন্ম নেওয়া একটি পরিবারের জন্য খুবই আনন্দের। নতুন অতিথির আগমনে বাড়িতে বেজে ওঠে আনন্দধ্বনি। সবাই উৎসবে মেতে ওঠে। কিন্তু একুশ শতকের এই সময়ে এসেও শিশু সন্তান ছেলে না হয়ে যদি মেয়ে হয় তবে সব আয়োজন একটু ম্লান হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার কন্যা সন্তান হলে তো তেমন কোনো আয়োজনও থাকে না। তবে আহাজারি থাকে।

প্রথম কন্যা সন্তান হলেই আনন্দ ফিকে হয়ে যায়। জোর করে সবাই হাসি টেনে মুখ থেকে কষ্ট লাঘব করেন। এত গেল শিশু কন্যা জন্মের গল্প। তারপর শিশু কন্যা বেড়ে ওঠে নানারকম 'না' বিদ্যা শিখে। তাকে বার বার শুনতে হয় 'তুমি মেয়ে','তুমি পারবে না', 'এটা করা উচিত না'। যদি কোনো কন্যা সেই 'না' কে 'হ্যাঁ' করতে চায় বা কোনো রকম অবমাননা করে তবে তো জীবনজুড়ে অমাবস্যা। আর অপবাদ তো আছেই।

কোনো পরিবারে পুত্র ও কন্যা দুজনই পড়ালেখা শুরু করে। কন্যা যতই মেধাবী, মনোযোগী বা আগ্রহী হোক, সে জানে তাকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। অতএব তার উপযোগী হয়ে উঠতে হবে। তাই গৃহকর্মের কাজ শেখে ভালো পাত্রস্থ হওয়ার আশায়।

কন্যার বাবা যদি দরিদ্র হয়, পড়ালেখা চালাতে কষ্ট হয়, তবে শত মেধাবী হলেও পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। দরিদ্রতা থেকে রক্ষা পেতে ভালোভাবে খোঁজখবর না নিয়েই শিশু কন্যাটিকে বিয়ে দিয়ে দেয়। একটা অভিজ্ঞতা বলছি, কলেজে যাওয়ার পথে একজন মধ্যবয়স্ক লোকের সাথে একটি মেয়ে। মেয়েটির কোলে কয়েক মাসের শিশু। লোকটির সাথে অনেকক্ষণ মুখোমুখি বসে থাকায় লোকটির সাথে টুকটাক কথা হচ্ছিল। জানলাম মেয়েকে নিয়ে তার স্কুলে উপবৃত্তির টাকা আনতে যাচ্ছেন। আর কোলের শিশুটি তার নাতি অর্থাৎ সাথের শিশু কন্যার সন্তান। মেয়েটি নবম শ্রেণির ছাত্রী। করোনা সংকট চলাকালীন সময়ে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত। এতগুলো মুখের খাবার জোগাড় করতে না পেরে মেয়েকে বিয়ে দেন। প্রথম দিকে ভালোই ছিল। কয়েকমাস পরে অর্থাৎ বাচ্চা জন্মানোর আগেই জামাই মেয়েকে রেখে গেছে আর নিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। বার বারই বলছে কোনো কাজই পারে না। কিন্তু ও এখন দুবাসায় কাজ করে মাস গেলে ভালো বেতন পায়। কাজ না পারলে তারা কেন রাখবে! তাকে জিজ্ঞেস করলাম,'আপনার আরও ছেলেমেয়ে আছে?' বললেন, 'হ্যাঁ, দুইটা ছেলে'। মনে মনে রেগে জিজ্ঞেস করলাম, 'ছেলেদেরও বিয়ে দিয়েছেন?' লোকটা তো অবাক, 'না, বড়োটা এসএসসি পাস দিছে। ছোটোটা সেভেনে পড়ে।' আমি আবার বললাম, 'ছেলেদেরও বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই করে দিতেন, আরও দুটো মুখ কমতো।'

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন,'ওরা পড়ালেখা শিখে কাজ করবে। কাজ করে ভালো বিয়ে করবে'। ওরা মেয়ে হলে বিয়ে দিয়ে দিতাম। পয়সা খরচ করে পড়াতাম না। পরের বাড়িই তো যাবে দুদিন আগে আর পরে।' আমিও বললাম, 'ছেলেরাওতো বিয়ে করবেই দুদিন আগে আর পরে। সমস্যা কোথায়!' তিনি প্রায় চিৎকার দিয়ে বললেন,'ছেলে আর মেয়ে কি এক? এই জন্যই স্ত্রীলোক পড়ালেখা করেও কোনো লাভ নেই। এত পড়াশুনা করেও অবুঝের মতো কথা বলছেন!'

হয়ত সত্যিই তাই। আমি হয়ত অবুঝের মতো কথা বলছি।

আরও আছে। মেয়ে এসএসসি পাস করেছে। কলেজ করছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। অভিভাবককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন এত ছোটো মেয়েকে বিয়ে দিলেন?' তিনি বললেন,'ভালো পাত্র হাতছাড়া করলাম না।'

ভালো পাত্র পেলে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে বাবা-মা কৈশোর পেরোনোর আগেই মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে দেন। মোট কথা মেয়েটির জন্ম বিয়ের জন্য। অন্য সবকিছু আনুষঙ্গিক। ভালো পাত্রের সংজ্ঞাটা অবশ্য আমার জানা নাই। আচ্ছা! মেয়েটিও কি আমার সন্তান না! এমনি কি ভাবা যায় না যে মেয়েটিও ছেলের মতো পড়াশুনা করবে? চাকরি করবে। তারপর নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করে সংসার বাঁধবে! ছেলে এবং মেয়ে ধারণ এবং জন্মদানে মা তো সমান কষ্টই করে। তবে মা-ই কেন সবার আগে মেয়েকে পেছনে টেনে রাখে? সন্তান মেয়ে হলে মুখ ভার করে? উত্তরটা বোধ হয়– মা তো নিজে মেয়ে, সকল গঞ্জনা সহ্য করে চলেন। তিনি চান না তার রক্ত-মাংসে বেড়ে ওঠা শিশুটি তার মতো হোক।

অনেক মা পুত্র সন্তানের জন্ম না দিতে পেরে তালাকপ্রাপ্ত হন। আবার কেউ সতিনের ঘর করতেও বাধ্য হন। আর জন্মের পর সন্তানের সকল অবাধ্যতার জন্য মাকেই দোষারোপ করা হয়। একবিংশ শতাব্দীর আরেকটি অভিশাপ ধর্ষণ। কারণ হিসেবে বলা হয় নারী পর্দা করে না।

এখানেও বৈষম্য নারী-পুরুষ উভয়ের পর্দা জরুরি। সেটা শেখানো হয় না। শুধু নারীদের ওপর পর্দা চাপিয়ে দেওয়া হয়। অসংখ্য বৈষম্যের মধ্যেই অনেক নারী বেড়ে উঠছে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য। প্রতিদিন সংসার, ছেলেমেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ি, বাবা-মা সামলিয়ে চাকরিও করছেন। সব সামলিয়েও এগিয়ে যাচ্ছেন অসংখ্য নারী।

পুত্র বা কন্যা নয়, একমাত্র পরিচয় হোক 'সন্তান'। আমরা যদি কন্যা বা পুত্র না ভেবে সব সন্তানকে সমান গুরুত্ব দিয়ে তার সহজাত প্রতিভাকে যত্নের মাধ্যমে বড়ো করি তাহলে দেশে অকেজো বা বোঝা বলে কিছু থাকবে না। উত্তরোত্তর প্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে।

জেসমিন বন্যা: সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, সাটুরিয়া সৈয়দ কালুশাহ কলেজ

সাক্ষরতায় রোল মডেল বাংলাদেশ

সুস্মিতা চৌধুরী

সাক্ষরতা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবীয় অধিকার হিসেবে বিশ্বে গৃহীত হয়ে আসছে। এটি ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক ও মানবীয় উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এমনকি শিক্ষার সুযোগের বিষয়টি পুরোপুরি নির্ভর করে সাক্ষরতার ওপর। সাক্ষরতা মৌলিক শিক্ষার ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে। দারিদ্র্য হ্রাস, শিশুমৃত্যু রোধ, সুষম উন্নয়ন এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি বিকশিতকরণের ক্ষেত্রেও সাক্ষরতা প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। সাক্ষরতার মূল কথা সবার জন্য শিক্ষা। তাই একটি মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা মানুষকে মানুষ হিসেবে সাক্ষরতা ও দক্ষতার সঙ্গে তৈরি করতে সহায়তা করে। কারণ বিশ্বের সকল উন্নয়ন ও আবিষ্কারের মূলমন্ত্রই হচ্ছে শিক্ষা। মানবসম্পদ উন্নয়নে এর কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষাহীন মানুষ আর পশুতে কোনো তফাৎ নেই। যার শিক্ষা নেই বলা যায় তার কিছুই নেই। তাই ইউনেস্কো সারা বিশ্বে জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

দেশে দেশে সাক্ষরতার সংজ্ঞা অনেক আগে থেকে প্রচলিত থাকলেও ১৯৬৭ সালে ইউনেস্কো প্রথম সাক্ষরতার সংজ্ঞা চিহ্নিত করে এবং পরবর্তী সময়ে প্রতি দশকেই এই সংজ্ঞার রূপ পাল্টেছে। এক সময় কেউ নাম লিখতে পারলেই তাকে সাক্ষর বলা হতো। কিন্তু বর্তমানে সাক্ষর হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য অন্তত তিনটি শর্ত মানতে হয়, যেমন– ব্যক্তি নিজ ভাষায় সহজ ও ছোটো বাক্য পড়তে পারবে, সহজ ও ছোটো বাক্য লিখতে পারবে এবং দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ হিসাবনিকাশ করতে পারবে। এই প্রত্যেকটি কাজই হবে ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত। সারা বিশ্বে বর্তমানে এই সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে সাক্ষরতার হিসাবনিকাশ করা হয়। ১৯৯৩ সালে ইউনেস্কো এই সংজ্ঞাটি নির্ধারণ করে, তবে বর্তমানে এটিও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। অনেক আন্তর্জাতিক ফোরাম বা কনফারেন্স থেকে সাক্ষরতার সংজ্ঞা নতুনভাবে নির্ধারণের কথা বলা হচ্ছে, যেখানে সাক্ষরতা সরাসরি ব্যক্তির জীবনযাত্রা পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত হবে।

সাধারণত সাক্ষরতা বলতে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্নতাকে বোঝায়। তবে এক সময় শুধু স্বাক্ষর জ্ঞানকেই সাক্ষরতা বলা হতো। কিন্তু দিন দিন এর পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসরে সাক্ষরতা শব্দের প্রথম উল্লেখ ১৯০১ সালে লোক গণনার অফিসিয়াল ডকুমেন্টে। তখন স্ব অক্ষরের সঙ্গে অর্থাৎ নিজের নাম লিখতে যে কয়টি বর্ণমালা প্রয়োজন তা জানলেই তাকে সাক্ষর বলা হতো। ১৯৪০'র দিকে পড়ালেখার দক্ষতাকে সাক্ষরতা বলে অভিহিত করা হতো। আর ষাটের দশকে পড়া ও লেখার দক্ষতার পাশাপাশি সহজ হিসাবনিকাশের যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ সাক্ষর মানুষ হিসেবে পরিগণিত হতো। আশির দশকে লেখাপড়া ও হিসাবনিকাশের পাশাপাশি সচেতনতা ও দৃশ্যমান বস্তুসামগ্রী পঠনের ক্ষমতা সাক্ষরতার দক্ষতা হিসেবে স্বীকৃত হয়। বর্তমানে এ সাক্ষরতার সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতা, ক্ষমতায়নের দক্ষতা, জীবননির্বাহী দক্ষতা, প্রতিরক্ষায় দক্ষতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতাও সংযোজিত হয়েছে।

১৯৬৫ সালের ৮-১৯শে সেপ্টেম্বর ইউনেস্কোর উদ্যোগে ইরানের তেহরানে ৮৩টি দেশের শিক্ষাবিদ, শিক্ষামন্ত্রী ও পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ওই সম্মেলনে প্রতিবছর ৮ই সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব করা হয়। পরে ১৯৬৫ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ৮ই সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৬৬ সালে ইউনেস্কো প্রথম দিবসটি উদ্‌যাপন করলেও ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন সদ্য স্বাধীন দেশে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে হলে জাতিকে প্রথমেই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত কোনো জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে টিকে থাকতে পারে না। তাই আমরা দেখি, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যখন দেশের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তখন তিনি সর্বাধিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে তার ভিত্তিই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। তারপর আসে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা। তাই তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি

অবৈতনিকও করলেন। বঙ্গবন্ধু সময়ের চাহিদা পূরণ করে একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের দায়িত্ব ছিল নতুন দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কার্যকর সুপারিশ প্রণয়ন করা। ১৯৭৪ সালের ৭ই জুন সেই কমিশন রিপোর্ট দাখিল করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট আর প্রকাশিত হয়নি। আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হচ্ছিল কালো আইন দ্বারা। বঙ্গবন্ধু সেই আইন পরিবর্তন করে ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ জারি করেন। বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। গণশিক্ষা বিস্তার তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বঙ্গবন্ধু দেশের প্রথম বাজেটে জরুরি ভিত্তিতে বরাদ্দ করেছিলেন আড়াই কোটি টাকা। তিনি সবসময়ই গণমুখী শিক্ষাকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এজন্যই ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর কার্যকর হাওয়া সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে তাঁর নির্দেশনায় একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত পর্যাপ্ত বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাঠদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সরকার ঘোষিত রূপকল্প–২০২১-এর অন্যতম লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়া, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এর আলোকেই সরকার 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' এবং 'ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' প্রণয়ন করে। বর্তমান সরকারের শিক্ষা খাতে বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে প্রাথমিকে ভর্তির হার প্রায় শতভাগে পৌঁছেছে, ঝরে পড়া এবং বাল্যবিয়ে কমেছে। বছরের প্রথম দিনে সকল প্রাইমারি, মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় বিনামূল্যে বই বিতরণ সারা বিশ্বে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। প্রাথমিকের এক কোটি ৩০ লাখেরও বেশি শিশু উপবৃত্তি পাচ্ছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও অর্জিত হয়েছে জেন্ডার সমতা। সরকার বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে দারিদ্র্যের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু হয় কখনও বিদ্যালয়ে যায়নি, কিংবা কখনও প্রাথমিকে ভর্তি হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রোগ্রাম (পিইডিপি-৪)-এর আওতায় 'আউট অফ স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম' এসব শিশুদের দ্বিতীয় সুযোগ হিসেবে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসছে। সরকার ২০৩০ সালে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হার ৩০ শতাংশে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছে। মেয়েদের জন্য সাত বিভাগে করা হয়েছে সাতটি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও। কারখানার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় ২৪ হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় স্থাপন করা হয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম করার উদ্যোগ চলমান রয়েছে। সাক্ষরতার হার এ সরকারের আমলে বিগত বছরের তুলনায় বেড়ে হয়েছে ৭৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ, যা শিক্ষা অবকাঠামোতেও বিপ্লব সাধন করেছে। শিক্ষাবিদরা বলেন, বিনামূল্যের বই, উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিংসহ সরকারের নানা পদক্ষেপের ফলে শিক্ষা খাতে সুফল মিলছে এখন।

বর্তমান সরকার দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাক্ষরতা ও জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধিতে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ প্রণয়ন করেছে। এ আইনের আওতায় জীবন ও জীবিকায়ন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, উপানুষ্ঠানিক ধারায় বৃত্তিমূলক, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ এবং তথ্যপ্রযুক্তি সাক্ষরতা প্রদানের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)-তে জীবনব্যাপী শিক্ষার বৈশ্বিক ধারণার দিকে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে সকল নিরক্ষরকে মৌলিক সাক্ষরতা জ্ঞান প্রদানের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইসিটি বেইজড জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট ৪-এ জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম উৎসাহিত করা হয়েছে। শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের পরিমাণ বেড়েছে। করোনা মহামারি সময়েও সরকার অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন চালিয়ে গিয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের নিমিত্তে সরকার প্রাথমিক শিক্ষায় সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতার ও সকল কমিউনিটি রেডিওতে 'এসো ঘরে বসে শিখি' শিখন কর্মসূচি চালু করে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ প্রণীত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' ও 'টেকসই উন্নয়নের জন্য আলোচ্যসূচি ২০৩০'-এর অন্যতম প্রধান একটি বিষয় হচ্ছে 'সাক্ষরতা'।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য বর্তমান সরকার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট ৮১ হাজার ৪৯৯ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ দিয়েছে, যা সর্বমোট বাজেটের ১২ শতাংশ। এবারের সার্বিক বাজেটের আকার ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। দেশে ১৫-২১শে জুন ২০২২ সপ্তাহব্যাপী প্রথমবারের মতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনশুমারির জরিপ কাজ করা হয়। ২৭শে জুলাই রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রথম ডিজিটাল 'জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২'-এর প্রাথমিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার ৭৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষের সাক্ষরতার হার ৭৬ দশমিক ৫৬ শতাংশ এবং নারীদের সাক্ষরতার হার ৭২ দশমিক ৮২ শতাংশ। এই হার ২০১১ সালের আদমশুমারিতে ছিল ৫১ দশমিক ৭৭ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষের সাক্ষরতার হার ছিল ৫৪ দশমিক ১১ শতাংশ এবং নারীদের সাক্ষরতার হার ছিল ৪৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ।

দেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া, পিইডিপি ৪-এর সাব কম্পোনেন্ট ২.৫-এর আওতায় ৮-১৪ বছর বয়সি ১০ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সাক্ষরতা প্রসার কর্মসূচির জন্য ইউনেস্কো বাংলাদেশকে ১৯৯৮ সালে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮' প্রদান করে। এছাড়াও 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি ও 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'সমূহ বাস্তবায়নের সাফল্যের জন্য ২০১৪ সালে ইউনেস্কোর তৎকালীন মহাসচিব ইরিনা বোকোভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'শান্তি বৃক্ষ' পদক প্রদান করেন। এছাড়া বাংলাদেশ সাক্ষরতায় রোল মডেলস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পেয়েছেন আরও অনেক আর্ন্তজাতিক পুরস্কার।

সুস্মিতা চৌধুরী: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

শরৎ এসে গেছে

শারমিন ইসলাম

শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে—
বনের পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সবুজ-শ্যামল আর পাখির কলকাকলিতে মুখরিত আমাদের প্রিয় স্বদেশ ভূমিতে বর্ষার অবসানে তৃতীয় ঋতু হিসেবে আবির্ভূত হয় শরৎ। ভাদ্র-আশ্বিন মিলে শরৎকাল হলেও এটি ক্ষণস্থায়ী ঋতু। আশ্বিনের শুরু থেকেই সোনা রোদ দেখা যায়, আবার আশ্বিন শেষ না হতেই সে রোদ মিলেয়ে যায়। বসন্তের মতোই ক্ষণস্থায়ী শরৎ তার স্বল্প সময়ে প্রকৃতিকে অপূর্ব রূপ-লাবণ্যে ভরে তোলে। শরতের স্নিগ্ধ রূপ-মাধুর্য সহজেই আমাদের মনকে নাড়া দেয়। এ যেন এক পূর্ণতার ঋতু। শুভ্রতার প্রতীক শরৎ এসেই মেঘ আর রৌদ্রের লুকোচুরি খেলায় মেতে ওঠে। গাছের পাতায় ঝকঝকে রোদের ঝিলিক, মাঠে-প্রান্তরে সবুজের সমারোহ, নবীন ধানের মঞ্জুরিতে উদ্বেল সবুজের ঢেউ, নদীর তীরে ফুটে থাকা অজস্র শুভ্র কাশের গুচ্ছ, বাহারি ফুলের সমারোহ, দোয়েল-শ্যামা-পাপিয়ার মনমাতানো সুমধুর রাগিনী, ভোরের ঘাসে ও পাতায় চকচকে শিশিরের ছোঁয়া, সারা আকাশজুড়ে তুলোর শুভ্র মেঘের ভেলা— এসবই যেন জানান দেয় শরৎ এসে গেছে। শরতের আবেদন তাই প্রতিটি মানুষের কাছে আদরণীয়। দেশের মাটি, মানুষ আর প্রকৃতির সাথে গভীরভাবে মিশে আছে শরৎ। শরতের সাথে প্রকৃতির যে সুনিবিড় সম্পর্ক, তা বোধহয় অন্য কোনো ঋতুতে এতটা দেখা যায় না। শরতের গ্রামবাংলা যেন আমাদের জীবনের

প্রতিচ্ছবি। স্বপ্নের মতো মায়াবী আর ছবির মতো ঝকঝকে। শরৎ তার সৌন্দর্যের ডালা সাজিয়ে প্রকৃতিতে উদার হাতে বিলায়।

বাংলাদেশের ঋতু পরিক্রমায় শরৎকালের আছে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ফুল, ফল আর ফসলের দেশ বাংলাদেশের এই ঋতু সবার মনেই আনন্দের সঞ্চার করে। শরতের শুরুতে রোদ-বৃষ্টির খেলাতে সৌন্দর্য পিপাসুদের সঙ্গী হয় শিউলি, বেলি, দোলনচাঁপা, বকুল, শালুক, পদ্ম, জুঁই, কেয়া, কাশফুল, মাধবী, মল্লিকা, মালতি, গোলাপসহ আরও অনেক ফুল। আর বিলে বিলে ফুটে থাকা অসংখ্য শাপলা সবার নজর কারে। শরৎ মানেই যেন এতসব ফুলের সঙ্গে অপরূপ সৌন্দর্যের-খুনসুটি। এসময় ফল হিসেবে পাওয়া যায় আমলকী, জলপাই, জগডুমুর, তাল, অরবরই, করমচা, চালতা, ডেউয়া ইত্যাদি।

শরতের প্রভাতের সৌন্দর্য তুলনাহীন। হালকা কুয়াশা আর বিন্দু বিন্দু জমে ওঠা শিশির শরৎ প্রভাতের উপহার। শিশির বিন্দুতে যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন মনে হয় যেন চারদিকে ছড়িয়ে আছে অজস্র মুক্তদানা। আকাশজুড়ে মেঘেরা করে উড়াউড়ি। মেঘগুলো যেন উড়তে উড়তে ঢুকে যায় একদল থেকে আরেক দলে। কখনো উধাও হয়ে যায়। কোনো কোনো মেঘদল আসে দিগন্ত ছেড়ে, পাহাড়ের ঢালে। উল্লেখ্য, শরতের আকাশ গাঢ় নীল। সাদা মেঘের ওপাড়ে যেন নীলের গ্রাম। আবার শরৎকে পেয়ে প্রকৃতি আরও সবুজ ও সজীব হয়ে ওঠে। শরতের এই সবুজের বুকে আরও সবুজের আস্তরণ ছড়ায় ধানের গাছগুলো। মৃদু বাতাসে নেচে নেচে তারা মনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। আশ্বিনের শেষে চাষির মুখে ফুটবে হাসি। শরতের পরিষ্কার সুনীল আকাশ, ধান ক্ষেতে বাতাসের মেলা, আকাশে সাদা মেঘের ভেসে বেড়ানো– সবার মনকে পুলকিত করে। তাইতো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন–

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলা
নীল আকাশে কে ভাসালো সাদা মেঘের ভেলা।

শরতের দুপুর বড়োই নির্মল। শরৎ দুপুরের আলোয় ঘাস, ধান, বাঁশঝাড়, খড়ের চালে জমে থাকা শিশির বিন্দুগুলো শুকিয়ে যায়। নীলের প্রাচুর্যতা বেড়ে যায় আকাশে। সাদা হালকা মেঘগুলো তখন আনমনে উড়ে বেড়ায়। নীরব পাখা মেলে উড়ে সাদা চিল। মেঘের কাছাকাছিই যেন দেখা মেলে শিকারি ঈগলের। নির্মল দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলে তখন এর রূপ আরও মায়াবী মনে হয়। রোদ তার তীব্রতা কমিয়ে নিজেকে অনেকটা শীতল করে নেয়। শরৎ সন্ধ্যা এসে দাঁড়ায় লালিমার নীচে। লাল-কমলায় রাঙা হয় আকাশ। পাখিদের গানে গানে শরৎ সন্ধ্যা প্রবেশ করে রাতের ঘরে। ঝিরিঝিরি বাতাস বয়ে বেড়ায় প্রকৃতিতে। স্নিগ্ধতা আর কোমলতার এক অপূর্ব রূপ নিয়ে আসে শরতের রাত। শরৎ রাত্রির চাঁদ সারা রাত ধরে মাটির শ্যামলিমায় ঢেলে দেয় জ্যোৎস্নাধারা। এসময় দলবেধে ফুটে থাকে শাপলা-শালুক। দূর থেকে ভেসে আসে শিউলি ফুলের সুবাস। কচি ঘাসের ডগায় সঞ্চিত হতে থাকে বিন্দু বিন্দু শিশির কণা। আকাশে দেখা দেয় ঘন তারকার বন। রাতভর একটানা জ্বলতে জ্বলতে অনেক তারা নিভে যায়। শরতের পূর্ণিমা রাতে জ্যোৎস্নায় মন ভরে ওঠে। কী অপূর্ব জ্যোৎস্না রাতের দৃশ্য। শরতের জ্যোৎস্নার মোহিত রূপ নিজ চোখে না দেখলে বোঝা যায় না।

শরতের কথা মনে এলেই আমাদের চোখের কোণে ভেসে ওঠে ফুটন্ত সাদা কাশফুল। কাশফুলই যেন জানিয়ে দেয় শরতের আগমনি বার্তা। শরতের বিকেলে নীল আকাশের নীচে দোল খায় শুভ্র কাশফুল। পালকের ন্যায় নরম সাদা কাশফুলগুলো মনের কালিমা দূর করে। প্রকৃতি প্রেমীদের কাছে তাই শরৎ মানেই কাশফুল আর কাশফুল দিয়েই শরতের আগমনের বরণ। চোখ জুড়ানো আর মন ভোলানো কাশফুল দেখতে তাই মানুষ ছুটে আসে দূর-দূরান্ত থেকে। সবুজ প্রকৃতি আর নীল আকাশের মাঝে সাদা কাশফুল নৈসর্গিক সৌন্দর্যের ভাণ্ডার। কবি-মন হয়ে ওঠে চঞ্চল। লেখে কবিতা কিংবা গান–

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা
নবীন ধানের মঞ্জুরি দিয়ে সাজায়ে এনেছি বরণডালা।

কাশ-শিউলির শোভা উপভোগ করতে হলেও আমাদের শরতের কাছে যেতে হবে। বসন্তের পর শরৎ ছাড়া এমন কোনো ঋতু নেই যা ছোটো-বড়ো সকলের মনে দোলা দেয়। শরৎ কেবল অফুরন্ত স্নিগ্ধ-বিমুগ্ধ সৌন্দর্যের ঋতুই নয়, উৎসব-আনন্দেরও বটে। শরতের আগমনে উৎসবের সাজে সুসজ্জিত হয় বাংলাদেশ আর পুলকিত হয়ে ওঠে বাঙালির হৃদয়-মন। এসব কারণেই শরৎকে 'ঋতুরানি' বলা হয়। তাই উৎসবে-আনন্দে শরৎ চিরকালই বাঙালিদের প্রিয় ঋতু।

শারমিন ইসলাম: প্রাবন্ধিক

বঙ্গমাতা স্মৃতিপদক ২০২৩

বঙ্গমাতা স্মৃতিপদক ২০২৩ পেলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন। সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে এই পদক দিয়েছে বঙ্গমাতা সাংস্কৃতিক জোট। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিন উপলক্ষে ১২ই আগস্ট শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় এক অনুষ্ঠানে এই পদক দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আরও চার বিশিষ্ট নারীকে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা স্মৃতিপদক দেওয়া হয়। এর মধ্যে সেলিনা হোসেনকে কথাসাহিত্যে, হাসিনা মহিউদ্দিনকে সমাজসেবায়, সিতারা আলমগীরকে শিক্ষা ও সমাজসেবায় এবং কণা রেজাকে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পদক দেওয়া হয়।

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বঙ্গমাতা সাংস্কৃতিক জোটের প্রধান উপদেষ্টা ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন জোটের সভাপতি শেখ শাহ আলম।

প্রতিবেদন : জে আর পঙ্কজ

পরিবেশ রক্ষায় ওজোন স্তরের গুরুত্ব ও করণীয়

রূপায়ণ বিশ্বাস

পৃথিবী হলো মানুষসহ কোটি কোটি প্রাণীর আবাসস্থল। পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণের অস্তিত্বের কথা বিদিত। পৃথিবীর জীবমণ্ডল এই গ্রহের বায়ুমণ্ডল ও অন্যান্য অজৈবিক অবস্থাগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে একদিকে যেমন বায়ুজীবী জীবজগতের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি ওজোন স্তর গঠিত হয়েছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে পাঁচটি প্রধান স্তরে ভাগ করা যায়। স্তরগুলো হচ্ছে: ট্রপোমণ্ডল, স্ট্র্যাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল, তাপমণ্ডল ও এক্সোমণ্ডল। ওজোন স্তর হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একটি স্তর যেখানে তুলনামূলকভাবে বেশি মাত্রায় ওজোন গ্যাস থাকে। এই স্তর থাকে প্রধানত স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নীচের অংশে, যা ভূপৃষ্ঠ থেকে কমবেশি ২০-৩০ কিমি. উপরে অবস্থিত। ওজোন স্তরের প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি এবং গ্যাস থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা। এই বায়ু স্তর আছে বলেই এখনও মানবসভ্যতার অস্তিত্ব বর্তমান এবং ধ্বংস হয়নি পৃথিবী।

১৬ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব ওজোন দিবস। বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের গুরুত্ব ও ওজোন স্তর সুরক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৯৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিবছর এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। ১৯৮৫ সালের এক সমীক্ষা বলছে, গাছ কেটে ফেলায় এবং পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ফুঁটো দেখা গেছে এই স্তরে। আরও যাতে এই স্তর ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্যেই সবাইকে সচেতন করতে এই বিশেষ দিন পালিত হয়। ওজোন স্তর রক্ষায় এবারের প্রতিপাদ্য– 'মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়ন করি– ওজোন স্তর রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করি'।

মানুষের দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে ওজোন স্তর দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। ক্ষয়িষ্ণু ওজোন স্তরের মধ্যে দিয়ে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি অতি সহজেই পৃথিবীতে প্রবেশ করে মানবস্বাস্থ্য, জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও অণুজীবের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। মাত্রাতিরিক্ত অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানুষের ত্বকে ক্যান্সার, চোখে ছানি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসসহ স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যায়। ওজোন স্তর ক্ষয়ের কারণে বিভিন্ন জীব ও উদ্ভিদের ক্ষতির মাধ্যমে পৃথিবীর প্রাণিমণ্ডল হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এছাড়া ওজোন স্তর ক্ষয়ের পরোক্ষ প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা ও মরুময়তাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ওজোন স্তর রক্ষায় জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) উদ্যোগ ১৯৮৫ সালের ২২শে মার্চ ভিয়েনায় একটি আন্তর্জাতিক সভায় 'ভিয়েনা কনভেনশন' গৃহীত হয়। এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য ছিল ওজোন স্তর বিষয়ক গবেষণা, ওজোন স্তর মনিটরিং ও তথ্য আদান-প্রদান। কিন্তু ভিয়েনা কনভেনশনের আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকায় এরই ধারাবাহিকতায় ওজোন স্তর রক্ষায় ১৯৮৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর কানাডার 'মন্ট্রিল প্রটোকল' গৃহীত হয়। ওই দিনই ৪৬টি রাষ্ট্র মন্ট্রিল প্রটোকলে স্বাক্ষর করে এবং বর্তমানে জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্র এই প্রটোকল স্বাক্ষর করেছে। মন্ট্রিল প্রটোকল গৃহীত হওয়ার ফলে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সিএফসি) ও হ্যালনগুলোর ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে এগুলোর ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংশোধনী ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রটোকলটি সময়পোযোগী করে তোলা হয়।

ওজোন স্তর রক্ষায় গৃহীত মন্ট্রিল প্রটোকলের সর্বশেষ সংশোধনী কিগালি সংশোধনী (কিগালি অ্যামেন্ডমেন্ট) নামে পরিচিত। ২০১৬ সালের ১৫ই অক্টোবর রুয়ান্ডার রাজধানী কিগালিতে অনুষ্ঠিত মন্ট্রিল প্রটোকলের ২৮তম পার্টি সভায় এই সংশোধনী গৃহীত হয়। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এই সংশোধনীকে একটি

যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সংশোধনীতে অধিক বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ক্ষমতাসম্পন্ন হাইড্রোফ্লোরো কার্বনের (এইচএফসি) ব্যবহার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার (ফেজ-ডাউন) সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিগালি সংশোধনীতে ১৮ প্রকার এইচএফসি নিয়ন্ত্রণ করার কথা রয়েছে।

মন্ট্রিল প্রটোকল এরই মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এ প্রটোকল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এরই মধ্যে ১০ গিগাটন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সমপরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নিঃসরণ এড়ানো সম্ভব হয়েছে, যা কিয়োটো প্রটোকলের প্রথম কমিটমেন্ট পিরিয়ডের প্রায় পাঁচগুণ। উল্লেখ্য, কিগালি সংশোধনী বাস্তবায়িত হলে এ শতাব্দীর শেষে দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এড়ানো সম্ভব হবে, যা প্যারিস চুক্তিতে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধিক তাপমাত্রা না বাড়ানোর যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে– তা বাস্তবায়নে অনেকাংশে সহায়ক হবে বলে ধারণা করা হয়। বর্তমান সময়ে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী রাসায়নিক দ্রব্যগুলোর পরিবর্তে এমন সব বিকল্প বিবেচনা করা হচ্ছে, যা ওজোন স্তর ক্ষয় করবে না এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালের ২রা আগস্ট মন্ট্রিল প্রটোকলে অনুস্বাক্ষর করে এবং পরবর্তীকালে লন্ডন, কোপেনহেগেন, মন্ট্রিল ও বেইজিং সংশোধনীগুলোয় অনুস্বাক্ষর করে। ২০১৬ সালে হাইড্রোফ্লোরো কার্বন বা এইচএফসির ব্যবহার হ্রাসের লক্ষ্যে রুয়ান্ডার রাজধানী কিগালিতে এ প্রটোকলের 'কিগালি সংশোধনী' গৃহীত হয়। সরকার কিগালি সংশোধনীর গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০২০ সালের ৮ই জুন কিগালি সংশোধনীতে অনুস্বাক্ষর করেছে।

মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এই প্রটোকল বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৯৬ সাল থেকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নে বৈশ্বিক সাফল্যের অংশীদার। বাংলাদেশ এই সাফল্যের অংশীদার হিসেবে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি দ্বারা ২০১২ ও ২০১৭ সালে বিশেষভাবে প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছে। তাছাড়া ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য চোরাচালান রোধে কার্যকর ভূমিকার জন্য ২০১৯ সালে সরকার জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের ফলে ধীরে ধীরে সূর্যালোক পৃথিবীর প্রাণিকুলের জন্য নিরাপদ হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের অভিমত, এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে ওজোন স্তর তার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

ওজোন স্তর রক্ষাকল্পে শেখ হাসিনার সরকার– পরিবেশ আদালত আইন ২০১০, বিপদজনক জাহাজ ভাঙার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১ এবং ২০১৪ সালে একটি সংশোধিত ও পরিমার্জিত ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। এছাড়া জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৯ এবং বিশুদ্ধ বায়ু আইনের খসড়া প্রস্তুত করেছে।

পৃথিবীর প্রায় ৬০ ভাগ কার্বন নিঃসরণ করে থাকে আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, ভারত, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য। ওজোন স্তর রক্ষায় এসব দেশকে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে এনে বিকল্প জ্বালানির সন্ধান করতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানির প্রয়োগ কমিয়ে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। যেমন হতে পারে সূর্যশক্তি, বায়ুশক্তি, পানিশক্তির মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার।

ওজোন স্তর রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো ক্ষতিকারক গ্যাসগুলোর ব্যবহার রোধ করা। যেমন: ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সিএফসি), বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হ্যালোজেনেটেড হাইড্রো কার্বন, মিথাইল ব্রোমাইড এবং নাইট্রাস অক্সাইডের মতো ক্ষতিকারক গ্যাসসমূহ। কার্বন মনোক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড মুক্ত করে এমন ব্যক্তিগত যানবাহনের ব্যবহার হ্রাস করা। ওজোন স্তর সংরক্ষণের অন্য উপায় হলো এয়ার কন্ডিশনার সঠিকভাবে বজায় রাখা। যদি এসিগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয়, তবে সিএফসি গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে যাওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা থাকে। আমাদের চুল স্প্রে, রুম ফ্রেশনার ব্যবহার এড়ানো উচিত; কারণ এই পণ্যগুলো ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সিএফসি) ছড়িয়ে থাকে। রাসায়নিক সার তৈরির সময় বেশ কয়েকটি গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরি হয়। সুতরাং আমাদের কৃষিতে সারের ব্যবহার এড়ানো উচিত এবং জৈব পদার্থের ব্যবহার বাড়ানো উচিত।

বাসযোগ্য পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষায় আমাদের অবশ্যই আরও বেশি সতর্ক হতে হবে। মনে রাখতে হবে, মানবসৃষ্ট দূষণ ও বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে প্রকৃতি প্রদত্ত নিরাপত্তাবেষ্টনী ওজোন স্তর দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। নির্বিচারে বনভূমি উজাড় করার ফলে অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষিত হচ্ছে না। ফলে ওজোন স্তরের ক্ষয়জনিত কারণে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি মাত্রাতিরিক্ত পৃথিবীতে পৌঁছাচ্ছে। এভাবে পৃথিবী হয়ে উঠছে উত্তপ্ত। ওজোন স্তরে ক্ষয়ের সাম্প্রতিক কয়েক বছরের তথ্য সবাইকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলছে। ভয়াবহ এ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে জনসচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। ব্যক্তিগত সচেতনতার পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি দেশের সরকারকে। আমাদের উচিত এক হয়ে ওজোন স্তর রক্ষায় এগিয়ে আসা। প্রাণিকুলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ওজোন স্তর রক্ষা করা জরুরি। পৃথিবীতে আজ সর্বত্রই প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়ে চলেছে। দৃশ্যমান হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। তাই আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য সবুজ পৃথিবী রেখে যেতে হলে ওজোন স্তর রক্ষায় শিল্পোন্নত দেশসমূহকে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে। এ ব্যাপারে পৃথিবীর সব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওজোন স্তর রক্ষায় ও সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এছাড়া সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মন্ট্রিল প্রটোকল প্রতিটি রাষ্ট্র মেনে চলছে কি না, তা জাতিসংঘের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং কোনোভাবেই যেন চুক্তির ব্যত্যয় না ঘটে, তা খেয়াল রাখতে হবে। আর তা করতে হবে আমাদের স্বার্থেই, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যই।

রূপায়ণ বিশ্বাস: প্রাবন্ধিক

সোনার মেয়ে আলো

নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর

নিটোল জলের পুকুর। পুকুরে সাঁতার কাটছে একটা কিশোরী। সে সাঁতার কাটছে আর কবিতা আবৃত্তি করছে। সে নিজেকে ভাবে শামসুর রাহমান-এর কবিতার কিশোরী; কবি যাকে দেখছেন এমনভাবে– স্বাধীনতা তুমি গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার...

এই মেয়েটির নাম আলো। সে শান্তিপুর হাইস্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। ঘরের কাজ করে। ওদের সবজি বাগানের যত্ন নেয়। ওদের মাচায় লাউয়ের ডগা বাতাসে দোলে। রহমতের মনে হয় আলো লাউডগার মতো বেড়ে উঠছে।

আলোর পিতা মনে মনে বলে– আমার মায়াডা সবুজ লাউডগার মতন। আলোর মুখ দেখে তার মেয়ের মায়ের মুখ মনে পড়ে।

রহমতের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। অসুস্থ স্ত্রীর কথা মনে পড়ে তার। শয্যাশায়ী স্ত্রীর মুখ চোখে ভাসে।
– আমার মায়াডারে আদর দিয়া বড়ো কইর। আর কেউ ওর মা অইতে পারব না।
আলো স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে। রহমত ওর সাথে যায়। আজ তার গা গরম করেছে। তবুও সে যেতে চায়।
– আব্বা, তুমি শুয়ে থাক।
– তোরে স্কুলে দিয়া আসি।
– আমি কি আর বাচ্চা আছি? আমার লগে আসন লাগব না।
– বাপের কাছে মেয়ে বড়ো হয়?
– হয়।
– রহমত মেয়ের পেছনে পেছনে হাঁটে আর মেয়ের কথা ভাবে।

রহমত আলোকে ওর বড়ো হয়ে ওঠার কথা বলতে পারে না। বড়ো হতে হতে ওকে কখন কী করতে হবে, কী ব্যবস্থা নিতে হবে বাপ সে কথা বলতে পারে না। কেবল মা বলতে পারে। একটা মেয়ে যখন বড়ো হয়ে ওঠে তখন মা হয়ে ওঠে ওর সই-এর মতো। এ বয়সে মা ওকে অজানা গোপন কথা বলে, মেয়ে কেমন করে বড়ো হয় জানায়, পথ কীভাবে চলবে শেখায়। সে যে মেয়ে থেকে নারী হয়ে উঠছে সে কথা মা-ই ওকে জানায়।

আলোর মা নেই। ওর মা মারা গেছে তিন বছর আগে যখন ওর বয়স আট। এরপর রহমতকেই ওর মায়ের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। মেয়ের কথা ভেবে রহমত আর বিয়ে করেনি।

রহমত নিজেও তার মাকে হারিয়েছিল পনেরো বছর বয়সে। রহমতের মায়ের যে অসুখ হয়েছিল তাও চিকিৎসায় সারবার ছিল না। সে অসুখের কথা কাউকে বলারও ছিল না। স্তন ক্যান্সারের কথা কি কাউকে বলা যায়?

মায়ের মৃত্যুর পর সৎ মা ঘরে আসার পর রহমতের কী অবস্থা হয়েছিল সে কথা গাঁয়ের লোকও জানে। সেদিনগুলোর কথা মনে করেই আলোর মায়ের মৃত্যুর পর রহমত বিয়ে করেনি। পিতার আদরে আলো মায়ের অভাব ভুলে গেছে।
আলো বড়ো হচ্ছে। কিন্তু ওকে কে বলবে ওর বড়ো হবার কথা? বরং মেয়ে নিজেই মাঝে মাঝে বলে–
– আব্বা, আমি তাড়াতাড়ি বড়ো হবার চাই।
– কেন?
– ডাক্তার হব।
– সারাদিন খেলাধুলা করলে ডাক্তার হতে পারবি?
– পারব। খেলাধুলা করলে ব্রেইন ভালো থাকে।
– তোরে কে কইছে?

– আমি বইতে পড়ছি।

আলো দুরন্তপনায় মেতে থাকে। দস্যিপনা করলেও সে লেখাপড়ায় বেশ ভালো। শিক্ষকরাও ওকে আদর করে।

আলো স্কুলের অনুষ্ঠানে গানও গায়– দাও দাও আরো আলো... আলো কবিতা পড়ে– আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা, ত্বরিতে পারি শকতি যেন রয়...

আলো ছোটোদের নিয়েও মাতামাতি করে। ওদের সঙ্গে নিয়ে এক্কাদোক্কা, গোল্লাছুট আর খড়ের গাদার আড়ালে আড়ালে লুকোচুরি খেলে।

আলো কথা বলে মাতিয়ে রাখে সবাইকে। পাড়াপড়শি ওকে ভালোবাসে। তারা সবাই বলে– আমাদের আলো দেখতে কালো, কিন্তু সে আমাগো নয়নের আলো। সে অনেকের এটা সেটা ঘরের কাজও করে দেয়। পাড়ার নারীরা আলোকে আদর করে এটা ওটা খেতে দেয়। সেও মজা করে খায়।

পাড়ার ছোটো বাচ্চাদের আলো এমনিতেই ইংরেজি পড়া বুঝিয়ে দেয়, অঙ্ক কষে দেয়।
তারা আফসোস করে বলে, আজ যদি তোর মা বাইচা থাকত কত খুশি হইত।
– তোমরাই আমার মা। তোমরা খুশি হইলেই মা কবরে খুশি থাকব।
– আল্লাহ অনেক বড়ো করুক।
আলো স্কুলের মেয়েদের নিয়ে ফুটবল খেলে। গাঁয়ের লোক বলে,
–মেয়ে বড়ো হচ্ছে। ওর কি আর ছেলেদের খেলা মানায়?
– মা, মেয়েরা কি সব খেলা খেলে?

আলো বলে, খেলা খেলাই। মেয়ে হলেই খেলতে পারবে না এমন কোনো কথা নেই।

রহমত জানে, মেয়েদের খেলা কোনো কোনো শিক্ষক পছন্দ না করলেও স্কুলের প্রধান শিক্ষক পছন্দ করেন।

বাংলাদেশের মেয়েরা এখন বিদেশে গিয়েও খেলে বিজয়ী হয়ে আসছে। ওরা কেন খেলবে না?

জেলা শিক্ষা অফিসার স্কুলের মেয়েদের খেলার প্রশংসা করেন। ডিসি সাহেবও ওদের খেলা দেখে পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করেন।

কোনো নারীর শরীর খারাপ হলে আলো নিজেই খোঁজখবর নেয়।
– অসুখের কথা চাচাকে কও না কেন?
– মেয়েলি অসুখ। সব অসুখের কথা কউন যায় না।
– কউন যাইব না কেন?
– বড়ো হইলে বুঝবি।
– ডাক্তারের কাছে যাও।
– কে নিয়া যাইব? তোর চাচা তো ফুরসৎ পায় না।
– চাচা সময় করতে না পারলে আমি ডাক্তারের কাছে নিয়া যামু। চল আমার লগে।
– তুই!
– হ।

গ্রামের পথ। ভ্যানে আলো আর একজন নারী। যেতে যেতে কথা বলে।
– ডাক্তারের কাছে সমস্যার কথা বলবা। কিছু লুকাইবা না। অসুখ যত কঠিন হোক সময় মতো চিকিৎসা করলে ভালো হয়।
– তুই মনে হয় অহনই ডাক্তার হয়া গেছস।
– একদিন আমি ডাক্তার হমুই।
– দোয়া করি ডাক্তার হ মা। মেয়েদের অসুখের কথা আপন মাইনষের কাছেই কওন যায়।
– অত অল্প বয়সে কী কঠিন অসুখে তোর মা মরে গেল!
– আল্লাহ তোমারে যেন অমন অসুখ না দেয়। কিন্তু সাবধানে থাকতে হবে।

স্কুল থেকে জানানো হয়েছে, ওদের বয়সি মেয়েদের কী যেন এক টিকা দেবে। কিন্তু মেয়েরা সেটা নিতে রাজি হচ্ছে না। ও ওদের মায়েদের কাছে এসে ওদের ভয়ের কথা, অনিহার কথা জানিয়েছে।

বিষয়টা লজ্জার বলে মেয়েরা ওদের বাপের কাছে কিছু বলছে না ।

কিশোরী মেয়েরা সব কথা বাপকে বলতে পারে না। মাকে বলে। মায়েরা মেয়েদের বাপকে বলছে।

বাপেরা স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে মেয়েদের টিকা দেওয়ার বিষয়ে আপত্তির কথা জানিয়ে গেছে। এ যুগেও মানুষ এত অসচেতন হলে দেশ এগোবে কী করে?

প্রধান শিক্ষক ভাবনায় পড়ে গেছেন। কিশোরী মেয়েদের ভবিষ্যৎ অসুখের আশঙ্কার কথা ডাক্তাররা সহজেই যার-তার সামনে উচ্চারণ করলেও প্রধান শিক্ষক মেয়েদের সামনে মুখেই আনতে পারেন না। আর গ্রামের মানুষকে তিনি বোঝাবেন কী করে? বয়ঃসন্ধিকালের ব্যাপারগুলো ছেলেমেয়েদের জানানো দরকার। ক্লাসে বলতে গেলেই মুখে আসতে চায় না। শিক্ষকরা কায়দা করে কিছু কিছু বলেন। অথচ সহজ করে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে কী কী অভিজ্ঞতার মুখোমুখি মেয়েদের-ছেলেদের হতে হয় এগুলো আগে থেকে জানতে পারলে ভালো হয়। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে সুবিধা হয়।

এমনটা রহমতও ভাবে। কিন্তু সব কথা পিতা হয়ে মেয়েকে বলা যায় না। রহমত এখন মেয়েটার মায়ের মৃত্যুর আসল কারণ জানে। তখন যদি এমন টিকা দেবার ব্যবস্থা থাকত!

আজ যে সুযোগ এসেছে সেটা কেবল আলোকে নয়, সকল কিশোরী মেয়েকে জানানো দরকার। কিন্তু গ্রামের অবুঝ মানুষ টিকা দেবার বিরুদ্ধে। কোভিডের টিকার বেলায়ও এমনই ভুল বুঝেছিল তারা। ভুলের খেসারত কত মানুষকে দিতে হয়েছে!

কিশোরীদের টিকা দেবার বিষয়টা গ্রামের হাটে মাইকিং করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, মেম্বার আর স্বাস্থ্যকর্মী নারীরা বাড়ি বাড়ি এসে বলছে। কিন্তু তারপরেও কেউ টিকা নেবে বলে মনে হচ্ছে না। টিকা নিতে যেতে দেবে বলে মনে হয় না। মায়েরাও তাদের মেয়েদের টিকা নিতে দিতে চায় না। কী না কী হয়!

রহমত ভাবছে, তার মেয়ে কি টিকা নেবে না? অন্যরা না নিলে সে কি একা নিতে চাইবে? কিন্তু মেয়েকে কথাটা কী করে বলবে? এটা যে ওর জীবন রক্ষার জন্য কত দরকারি সেটা কেমন করে বোঝাবে?

রহমতের কাছে গ্রামের কজন লোক এসে মেয়ের নামে নালিশ করে গেছে।
– তোমার মেয়েকে সামলাও।
– আলো কী করেছে?
– কী করেছে?
আলো কী অন্যায় করেছে তারা বলেনি। কেবল কটাক্ষ করে বলে গেছে, আট ক্লাসে পড়েই মেয়ে ডাক্তারি ফলায়! বড়ো বার বাড়ছে। তারে সামলাও।
– কী করে আলো?
– আলো নাকি বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাচি-ফুফুদের কী সব সলাপরামর্শ দেয়। যেন সে ডাক্তার হয়াই গেছে!
– ডাক্তার হইতে চাইলে দোষ কী?
– পাড়া বেড়ানো ছেমরি হবে ডাক্তার!

আলো ডাক্তার হতে চায়। রহমতও চায় আলো ডাক্তার হোক। সে যখন বলে, ডাক্তার হয়ে গ্রামের মেয়েদের চিকিৎসা করবে, ওর মায়ের মতো বিনা চিকিৎসায় কোনো মাকে মরতে দেবে না। তখন খুশিতে বুক ভরে যায়। কিন্তু মেয়ে তো জানেই না ওর মা কী অসুখে মারা গেছে।

স্কুলে মেডিকেল ক্যাম্প বসেছে। নার্স-ডাক্তার-শিক্ষক মেয়েদের বোঝাচ্ছেন জরায়ুমুখের ক্যান্সার সম্পর্কে। টিকা নিলে ওদের এই ঝুঁকি থেকে ওরা সুরক্ষিত হবে। কিন্তু ওরা টিকা নিতে চায় না। অনেকের মা-বাবারাও উপস্থিত আছেন।

শিক্ষকরা টিকা দেওয়াতে ব্যর্থ হতে যাচ্ছেন। প্রধান শিক্ষক আরেকবার চেষ্টা করেন। তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, সরকার ইউনিসেফের সহায়তায় এমন একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিলো, অনেক দেশের আগেই আমাদের ভবিষ্যৎ মায়েদের জীবন নিরাপদ করার জন্য টিকার ব্যবস্থা করল। আর আমরা মেয়েদের সে টিকা দেওয়াতে পারব না? তোমরা কি আলোকিত জীবন চাও না?

স্তব্ধতা ভেদ করে একটা মেয়ের গলা শোনা যায়।
– আমি চাই।
সকলেই দেখে আলো এগিয়ে আসছে।
আলো এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে বলে, আর কেউ না নিলেও আমি টিকা নিব।
প্রধান শিক্ষক– তুমি কেন নেবে?
– জ্বি, স্যার। আমি নিব।
আলো আবেগাপ্লুত। সে আর সব মেয়েদের মুখের দিকে তাকায়। তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে এ ওর মুখের দিকে তাকায়।
– আমি কেন নেব সে কথা আজ সবার সামনেই বলব।
প্রধান শিক্ষক– বলো।
আমার মায়ের অসুখের কথা আপনারা সকলেই তো জানেন। বলুন, কী অসুখে আমার মা মারা গেছে?
সবাই চুপ করে থাকে।
– কেউ যখন জাইনাও মুখে বলবেন না তখন আমিই বলছি। আমার মায়ের জরায়ুমুখের ক্যান্সার হয়েছিল।

আলো কাঁদছে। আর সকলেই চুপ করে আছে।

কান্নাজড়িত গলায় আলো বলে যায়, আমার মায়ের মতো অনেক মা জরায়ুমুখের ক্যান্সারে মারা যায়। তারা লজ্জায় পরিবারের কাউকে অসুখের কথা বলে না। অসুখ তো লুকিয়ে রাখার বিষয় না। আপনারা হয়ত বলবেন, সে অসুখ তো বড়োদের হয়। আমরা টিকা নেব কেন?
আলো সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন রাখে।
জনৈক বললেন– হ, ছোটোরা টিকা কেন নেবে?
– টিকা সময়মতোই নিতে হয়।
– বুঝলাম না।
– জরায়ুমুখের টিকা নিতে হবে আমার মতো বয়সের সব মেয়েদের। দশ-বারো বছর বয়সে, এই রোগের জীবাণু মেয়েদের শরীরে ঢোকার আগে।

ডাক্তার আর শিক্ষকরা সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন। অভিভাবকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও গুঞ্জন শোনা যায়। কেউ কেউ আলোর সাহস দেখে অবাক হয়।

– আমার মা আমার বয়সে জরায়ুমুখের টিকা পেলে তার ক্যান্সার হতো না। মা আমার বেঁচে থাকত।

আলো আরও বলে, আমরা সবাই লেখাপড়া করব, খেলাধুলা করব, বড়ো হব, বড়ো হয়ে একদিন সুস্থসবল মা হব।

আলো হাসিমুখে টিকা নেয়। টিকা নিয়ে অন্য মেয়েদের হাতছানি দিয়ে ডাকে।

– সবাই এগিয়ে আসো।

আলো বলে, আমাদের নিজের কথাও ভাবতে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

লাইন ধরে সব মেয়েই আনন্দের মধ্য দিয়ে টিকা নিতে থাকে। সকল মা-বাবা-শিক্ষক-ডাক্তার-নার্স খুশি।

আলোর পিতা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। খুশিতে তার চোখে পানি আসে। রহমত কাঁদছে দেখে মেয়ে দৌড়ে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে।

মেয়েরা সম্মিলিত গলায় গান ধরে, আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা...

দুর্নীতিকে না বলুন

রুখবো দুর্নীতি, গড়বো দেশ
হবে সোনার বাংলাদেশ

আলসেখানার মেয়ে

শেখ সালাহ্উদ্দীন

জননী তাঁর নাম দিয়েছেন আলসেখানার মেয়ে
এই মেয়েটি একটুখানি ভিন্ন সবার চেয়ে।
একলা ঘরে থাকত একা একা
সবার সাথে কম হতো তাঁর দেখা;
আশা করি আছে সবার জানা
কাকে বলে আলসে এবং কাকে আলসেখানা?
কাজেকর্মে আলসে লোকের মেলা
অরুচি আর থাকে অবহেলা;
আলসেখানার অর্থটাও তেমন কঠিন নয়–
আলসেরা যে ঘরখানাতে রয়।

আলসে এমন ছিল কি সেই মেয়ে?
না, সে ছিল একটুখানি ভিন্ন তাদের চেয়ে–
এক ধরনের ভাবালুতা যেন সারাক্ষণ
ঘিরে রাখে তাঁর কিশোরী মন
বইয়ের মাঝে চোখ দুটি আর মনটা ডুবে থাকে
তাইতো দেওয়া হয় না সাড়া মায়ের কোনো ডাকে।

বিয়ে হলো সেই মেয়েটির যখন হলো বড়ো
আলসেমিটা পুরোপুরি কাটলো না তারপরও।
স্বামীর সাথে ছিল সে প্রবাসে
এমন সময় ভয়াবহ সেই দুঃসংবাদ আসে–
জীবনটা তাঁর ছিল পরিপাটি
এ সংবাদে সরে গেল পায়ের তলার মাটি...

সেই আমাদের যাত্রা শুরু অন্ধকারের দিকে
দিনে দিনে স্বপ্ন আশা হচ্ছিল সব ফিকে।
বাজি রেখে জীবনটা সে শপথ নিলো যাতে
ঢেকে না যায় এ দেশ চন্দ্র-তারার পতাকাতে।
ছয়টি বছর যুদ্ধ করে শেষে
এলো ফিরে মেয়ে নিজের দেশে।
শক্ত হাতে ধরতেই দেশের হাল
কাটতে শুরু অশুভ সেই অমানিশার কাল...

চিন্তা করে বলুন তাঁকে চিনতে পারেন কি না
তিনি হলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা– শেখ হাসিনা।
জনগণের দুঃখে কাঁদেন, সুখটা তাঁকে হাসায়
সিক্ত তিনি তাই মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসায়।
যোগ্য পিতার মতোই তাঁর অঙ্গুলি হেলনে
শেকল ছিঁড়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জাগে মনে।

দেশের কাজে বেড়ান ছুটে সারাটাক্ষণ আজ
জীবন থেকেও দামি ভাবেন এখন তিনি কাজ।

মহীয়সী

চিন্ময় রায় চৌধুরী

একটি ভালো মানুষ দাও
শেখ হাসিনার মতো
যাঁর কোনো লোভ নেই
কর্মে নিবেদিত।

হৃদয় যাঁর ভালোবাসায়
বঙ্গবন্ধুময়
মমতায় ভরা প্রাণ
থাকে সব সময়।

অসীম সাহস বুকে যাঁর
ভীতির নেই লেশ
যতই কঠিন হোক না বাধা
জটিল পরিবেশ।

পদ্মা নদীর মতো তাঁর
দৃঢ়চেতা মন
সেই নদীতে সেতু বাঁধার
করল আয়োজন।

দেশি দালাল, বিশ্ব ব্যাংক
সবে মিলেমিশে
স্বপ্ন ভেঙে চাইল দিতে
মিথ্যে কথার বিষে।

নদীর স্রোত থামে না তো
অবিরাম চলে
তাইতো নদী শেখ হাসিনার
মনের কথা বলে।

থামবে না সে কোনো কালে
থাকতে এ জীবন
লক্ষ্য অটুট রাখতে জানে
মহৎ লোকের পণ।

মায়ের মতো, মেয়ের মতো,
বোনের মতো তাঁর
স্নিগ্ধ হাসির নিবিড় মায়ায়
সবেই আপন যাঁর।

একটি ভালো মানুষ দাও
শেখ হাসিনার মতো
কর্মনিষ্ঠ, দক্ষ, সৎ
থাকে অবিরত।

স্বনির্মিত তুমি

তাহমিনা কোরাইশী

ডেকেছে সকল আজ একটি দিনের সন্দেশ দিতে
শরতের সুবাস করে কানাকানি বাতাসের সাথে
সোনারোদ শুভক্ষণে জন্মদিনের শুভশিসে
ভালোবাসায় আঁকা আজ বাংলার নকশিকাঁথা ...
আপন মহিমায় স্বনির্মিত একটি নাম
সে তো তুমি, শ্রদ্ধায় ভালোবাসায়।

একাত্তরের যুদ্ধ অপরাধের বিচার পর্ব কথনে,
বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়া অধ্যায়ে,
নানাবিধ অঙ্গীকারে রাষ্ট্রীয় আঙিনায়
দীপ্ত আলোর মশাল জ্বেলে তুমি,
বৈশ্বিক মন্দায় শক্ত হাতে ধরেছ হাল
জয়ী তুমি হীরক জয়ন্তীর পাড়ান্তে।
মাথা নত করতে জানে না বাঙালি
সিদ্ধান্তে অটল তুমিও,
জাতীয় জীবনে সম্মানের আজ– পদ্মাসেতু।

আকাশ ভেঙে মাটিতে পড়েছিল যখন
তুষানলে পুড়ে খাঁটি সোনা হয়েছ তখন
যাপিত জীবনে কৃচ্ছ্রসাধন কাল-কালান্তর
সোনার চামচে হয়নি অন্নপ্রাশনের পালা।
রোপণ করে চলেছ স্বপ্নবৃক্ষ
দুঃখী মানুষের জীবনে অনাবিল আনন্দধারা
আস্থায় গড়েছ মানুষের জীবনকথা।
মাথার ওপর ছায়ামেঘ নিত্য পাহারায়
বুদ্ধিদীপ্ত আলোয় পথ দেখায় পূর্বসূরিরা
কঠিন শিলায় কণ্টক বিছানো পথে
ক্লান্তিহীন পরিব্রাজক তুমি।
এখনও মৃত্যু পরোয়ানা পিছু পিছু হাঁটে তোমারই
নির্ভীক দিশারি তুমি
ভালোবাসায় ধন্য পথিক এই বাংলায়
ভয়হীন রথে সদাজাগ্রত সত্তায়
প্রত্যয়ী প্রভায় তোমার জীবনগাথা
কাদাজলে ভাঙা শামুকে কেটেছে পা, রক্তাক্ত তুমি
তবুও অবয়বে পবিত্র জোছনা আলোর ছটা
দুর্মর গতিতে শুধুই ছুটে চলা, শুধুই ছুটে চলা।

অঞ্জলি ভরেছে আজ তোমার অর্জনে
শ্রদ্ধায় সিক্ত তুমি রংধনু রঙে রঙা
আমাদের ভালোবাসায়, সে তো অলকানন্দাধারায়।

তোমায় কী নামে ডাকবো

মিলি হক

কী নামে ডাকবো তোমায় বলো
অগ্নিকন্যা লৌহমানবী যা ইচ্ছা তা মানায় না
তুমি বঙ্গবন্ধুকন্যা
তুমি পুনর্গঠনের সূতিকাগার
উন্নয়নের পাঠাগার
যেন বিনির্মাণের অসংখ্য পুস্তকে
বুনন এক শিল্পী পাখি।

তুমি স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তিধর
মানসিক বলে অতল সাগর
তুমি শোকে মুহ্যমান নও
পিতৃহত্যা ভ্রাতৃহত্যা কত না শোক
তার চেয়েও যাতনা করেছ ভোগ
তুমি অসীম প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে
মহিরুহ দণ্ডায়মান
এত কিছু দিয়েছেন বিধাতা
তোমার যা কিছু কেড়ে নিয়েছেন
তার চেয়েও বেশি প্রাপ্তি
তাই তো আজ তুমি আমাদের নেত্রী।

দেশরত্ন

শচীন্দ্র নাথ গাইন

করিৎকর্মা মানুষ হিসেবে
তোমার তুলনা তুমি
তোমার পরশে সজীবতা পেল
প্রিয় এ জন্মভূমি।

আশাহত জাতি ভাষা খুঁজে পায়
এলে তুমি যেই পাশে
আকাশ-বাতাস চন্দ্র-সূর্য
অনাবিল হাসি হাসে।

তুমি শিখিয়েছ প্রতিবাদী হতে
ন্যায়ের ঝাণ্ডা তুলে
তোমার দু'হাত এগিয়ে দিয়েছ
অনাচার নির্মূলে।

পদে পদে বাধা ডিঙিয়ে চলেছ
সাহস রেখেছ বুকে
কঠিন সময় পাড়ি দাও তবু
মলিনতা নেই মুখে।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা
তুমি দিতে চাও গড়ে
দেশ-মানুষের কল্যাণে তুমি
অবিরাম যাও লড়ে।

উন্নয়নের অগ্রপথিক
জাদু যে তোমার হাতে
ভাগ্য ফেরাতে একাত্ম হয়ে
রয়েছ জাতির সাথে।

শুভ জন্মদিনে, কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে

কাজী সুফিয়া আখ্‌তার

তাঁর মুখজুড়ে বাংলার স্নিগ্ধ শ্যামলিমা
তাঁর দুই চোখে ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলের
সবুজ সতেজ বাংলাদেশ, নিখাদ ভালোবাসা অন্তরের
চারবারের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদরের কন্যা
বাংলার দুঃখী মানুষের সৌভাগ্যের প্রতিমা
সমৃদ্ধ উন্নয়নের অনুপম উপমা।

শত ষড়যন্ত্রে ডুবে যাওয়া নৌকা, মূলনীতি
পিতার আদর্শে বিশ্বাসী শক্তিতে উঠিয়েছেন
আজ শত নদীর বাঁকে উন্নয়নের জোয়ারে
চতুর্গুণ শক্তিতে নৌকা চলে তরতরিয়ে
কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পানে শত বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে
বাংলাদেশ এগিয়ে যায় তাঁর সাহসী নেতৃত্বে।

বারে বারে মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করা নির্ভীক ব্যক্তিত্ব
জনগণের মননে ভাগ্য ফেরানোর সংকল্প দেন বুনে
উজ্জীবিত করেছেন সংগঠিত মন্ত্রে, সমাজের তন্ত্রে
সহস্র কোটি আত্মজ-আত্মজা জাগিয়ে তুলতে দিয়েছেন
সংহত ভবিষ্যৎ স্বপ্ন; করেছেন বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার
যা ছিল কাঙ্ক্ষিত এ দেশের স্বাধীনতাকামী সবার।

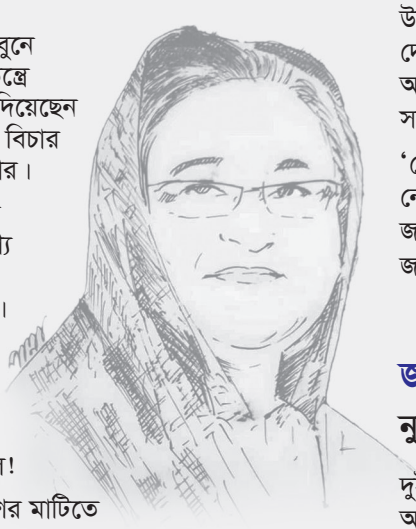

শহর-গ্রামের বিভেদ ঘুচে, আছে ঘরে ঘরে অন্ন
বাংলাদেশের মানুষ নয় আজ ঔপনিবেশিক পণ্য
নিজেদের অর্থে পদ্মসেতু গড়ে বিশ্বকে দেখাই
আপনার জন্য আজ আমাদের গৌরবের বড়াই।
২৮ সেপ্টেম্বরে, মানুষের হৃদয়ে আনন্দ অপার
আজ শুভ জন্মদিন শেখ হাসিনার
বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে, গাছগাছালিতে
কী ভীষণ আন্দোলিত হিন্দোল
আহা, চারদিক মুখরিত কী মিষ্টি পাখির কল্লোল!

শুভ জন্মদিন আসুক বারে বারে এই বাংলাদেশের মাটিতে
সাধারণ মানুষের প্রাণের আনন্দ বার্তা হয়ে।

যোগ্য পিতার যোগ্য মেয়ে

আতিক রহমান

রত্নগর্ভা মায়ের গর্বে জন্মেছিলেন তাই
ভুবনজুড়ে আনলে আজি আলোর সে রোশনাই!
বঙ্গবন্ধুর রক্ত তোমার শরীরে বহমান
এগিয়ে যাবার আদর্শ তাই– মুজিবুর রহমান।

আজকে পিতার যোগ্য মেয়ে দেশের কর্ণধার
কাজ করে আজ ঘটালে সে কী- উন্নয়ন জোয়ার!
বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ঊর্ধ্বাকাশে ভাসে
বাংলাদেশের মানুষ তাই তো আছে সবাই পাশে।
উন্নয়নশীল দেশ হয়েছে, বেড়েছে সবার আয়,
নৌকার মাঝি হয়ে দেশটা কেবল এগিয়ে যায়!
পিছু হটেছে দারিদ্র্যতা, অভাব পেয়েছে হ্রাস
উন্নয়নে দেশজুড়ে আজ বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস!

জন্মদিনে দোয়া এবং শুভকামনা, প্রীতি
ইতিহাসের পাতায়-পাতায় লেখব যত কৃতি!

শেখ হাসিনা

গোলাম নবী পান্না

দেশ আর জনগণ
ভাবনাটা নিয়ে
এগিয়ে চলার সেই
কথাটাই দিয়ে–

স্বপ্নের লক্ষ্যেই
শুধু পথচলা
এ শপথ থেকে যেন
হয় নাকো টলা।

জনগণ নিয়ে সাথে
লড়ে যান তাই
গড়ে যান দেশটাকে
মনে দিয়ে ঠাঁই।

উন্নয়নের ছোঁয়া
দেশের এ কাজে
আমরাও খুঁজে পাই
সফলতা মাঝে।

'শেখ হাসিনা' প্রিয়
নেত্রীর নাম
জন্ম এ দিন পেয়ে
জানাই সালাম।

জন্মের এই শুভ ক্ষণে

নুরুল ইসলাম বাবুল

দুই পাশে ফুটেছিল সাদা কাশফুল
অপরূপ সেজেছিল মধুমতী কূল
আকাশের ঘন নীলে উড়ে উড়ে চিল
খুঁজেছিল মাছে ভরা শাপলার বিল
সাদা সাদা তুলো মেঘ ভেসে চলে যায়
শোনা গেল ভাটিয়ালি মাঝিদের নায়।

শরতের সেইসব উৎসব দিনে–
ছোটো এক শিশু নিলো পৃথিবীকে চিনে
বাঙালির প্রিয় নেতা মুজিবের ঘরে
আনন্দ নেমে এলো যেন থরে থরে
কোলে তোলে দাদা-দাদি পাড়া-প্রতিবেশী
ছুটে আসে ছেলে-বুড়ো শত এলোকেশী
বাবা-মার হাসুমণি বড়ো হয়ে ওঠে
দিনে দিনে মুখে তাঁর নানা কথা ফোটে ।

সেই শিশু এ জাতির কাণ্ডারি আজ
প্রিয় পিতা দিয়ে গেছে বাকিটুকু কাজ
জনকের যত কাজ যত সব স্বপ্ন
নিজ হাতে করে সেতো দেশরত্ন
জন্মের এইক্ষণে শুভ কামনায়
ভালোবাসা জানালাম কানায় কানায়।

প্রাণ দায়ী নদী

শাফিকুর রাহী

গানের তালে নাচবে টুনি পাপিয়া বুলবুলি
মাঝির ভাটিয়ালি সুরে নাচবে কর্ণফুলী।
কুমার কুশিয়ারার ঢেউয়ে গাঙশালিকও নাচবে
পরিযায়ী নানান পাখি প্রাণটা খুলে বাঁচবে।
নদী দখল করবে না কেউ মারবে না কেউ পাখি
পাখির কলকাকলিতে জুড়াবে প্রাণআঁখি–

ফুল-পাখিদের অভয়ারণ্যে প্রাণের বাংলা হাসবে
দূষণমুক্ত নদীর জলে বাঁধনহারা ভাসবে।
জলে-ফলে ভরবে স্বদেশ সুখ-আনন্দে গাইব
স্রোতস্বিনীর জলতরঙ্গে সুরের সাম্পান বাইব।
পদ্মা-সুরমা কালিন্দী আর শীতলক্ষ্যার জলে
ধলেশ্বরী দুধকুমারে সোনার ফসল ফলে।

স্বপ্ন জাগানিয়া কত আশার ভাষায় নদী
সৃষ্টিরই কল্যাণের ধারায় বয় যে নিরবধি।
প্রাণদায়ী নদীপথে হানবে না কেউ বাধা–
তাহলে যে বাড়বে বিপদ মানুষ হবে গাধা–
নদী বাঁচলে বাঁচবে মানুষ সচিত্র সম্ভারে–
প্রকৃতিও সতর্ক সংকেত দিচ্ছে বারে বারে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জেগে গভীর রাতে
কান পেতে নদীর কান্না শুনতে তপস্যাতে।
কত না কাল নদীর বুকে কাটিয়ে দিলেন একা
নদীর স্রোতে ভেসে ভেসে গান-কবিতা লেখা।
বাংলা মায়ের রূপাগুণে মুগ্ধ কবি ভাবেন
নদীর অমন জলধারা আর কোথাও পাবেন !

হারিয়ে যেতে নেই মানা

ওমর ফারুক নাজমুল

মনটা হলে উড়ুউড়ু হারিয়ে যেতে নেই মানা
হিজল বনে ঘুঘুর ছানা খুঁজতে গিয়ে দেই হানা।
দুপুর কাঁদে উনকোটিতে ডাকছে ঝিঁঝিঁ পোকা।
দূরে পাহাড় ঝরনাধারায় স্বপ্ন খোঁজে খোকা।

মেঘের ভেলা করছে খেলা রোদ বৃষ্টির সাথে
বিকেল এলে রংধনুতে পুবের আকাশ মাতে।
মাঠ পেরিয়ে ছুটতে থাকি পদ্ম দিঘির ঘাটে
নাইতে গিয়ে যাই ভুলে যাই সূর্য নামে পাঠে।

কলাবাদুড় উড়ে বেড়ায় শাল পিয়ালের বনে
ডাকলে শিয়াল হুক্কাহুয়া ভয় লাগে এই মনে।
পড়ার ঘরে বসি যখন বইখাতা সব মেলে
বাইরে তখন চাঁদ হেঁটে যায় চাঁদটা সুবোধ ছেলে।

মনটা তখন উদাস হয়ে ছোটে নদীর তীরে
যাই হারিয়ে ইলিশ জালে গাঙশালিকের ভিড়ে।
পদ্মা বুকে সাঁতরে খুঁজি আমার সকল সুখ
পালতোলা নাও দেখতে গিয়ে ভাসাই জলে বুক।

ইলিক ঝিলিক চাঁদের হাসি মন পবনের নাও
বাঁদর নাচে গাঙের পাড়ে দেখতে সবে যাও।

মনের গহীনে গড়েছি নীপবন

রুহুল গনি জ্যোতি

মনের গহীনে গড়েছি নীপবন
সেখানে বসে জপছি সারাক্ষণ
তোমাকে চাই
তোমাকে চাই
তোমাকে চাই।
নির্জন রাতে ডুবেছি মৌনতায়
তোমাকে চেয়েছি একান্ত কামনায়
তোমারও বুকে যদিবা মেলে ঠাঁই
সেই হবে জানি অনন্ত আশ্রয়।
জীবন বোঝে না জীবনের ধারাপাত
দিবাস্বপ্নের ঘোর লেগে থাকে চোখে
প্রতিটি প্রভাত আশার জোয়ারে ভাসে
সুযোগ বুঝে কখনও সে ক্রুর হাসে
অপার্থিব এক স্বপ্ন তাড়িত মন
কাটছে সাঁতার তীরের ঠিকানা খুঁজে
কি এক নেশায় কেবলই ছুটছে সে
অনন্তলোক খুঁজে খুঁজে ফেরে
নিশিদিন সারাক্ষণ
মনের গহীনে গড়েছি নীপবন
সেখানে বসে জপছি সারাক্ষণ
তোমাকে চাই
তোমাকে চাই
তোমাকে চাই।

কতদিন দেখি না যে

রকিবুল ইসলাম

কতদিন দেখি না যে বাংলার গাঁও
ভরা নদী খেয়াঘাট ছৈতোলা নাও।
মেঠোপথ দুইপাশে সারি সারি গাছ
বাঁশঝাড়ে কানাবগা-বগীদের নাচ।

কতদিন শুনি না যে রাখালের সুর
দুপুরের রোদগুলো আহা কী মধুর!
পাখিদের কিচিমিচি বাতাসের গান
আঁকাবাঁকা নদীটার কলকলতান।

কতদিন দেখি না যে কৃষকের কাজ
গাছে-গাছে ফুলে-ফুলে আহামরি সাজ!
ফসলের মাঠ ভরা সোনা-ফলা ধান
একতারা হাতেধরা বাউলের গান।

কতদিন শুনি না যে ঝিঁঝিঁদের ডাক
বৈশাখে বেজে ওঠা টাকডুমা ঢাক।
ধানে আর গানে ভরা ফসলের মাঠ
সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠকের পাঠ।

কতদিন আর বলো কতদিন পর
ফিরে পাবো বাংলার মা-মাটি-ঘর।
বাংলার পথে-ঘাটে হেঁটে খালি পায়
যেতে চাই খেটে খাওয়া প্রিয় বাংলায়।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ২৬শে আগস্ট ২০২৩ বঙ্গভবন দরবার হলে অ্যানিমেশন মুভি 'মুজিব ভাই' অবলোকন করেন– পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ স্বাধীনতাকামী মানুষের অধিকার আদায়ে অনুপ্রেরণা জোগাবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নীতি ও আদর্শ স্বাধীনতাকামী মানুষের অধিকার আদায় ও শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণজাগরণে সব সময় অনুপ্রেরণা জোগাবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তিনি এ দেশের লাখো-কোটি বাঙালিরই শুধু নয়, বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্যও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবেন। ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আজ ১৫ই আগস্ট। ১৯৭৫ সালের এ দিনে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্যের নির্মম বুলেটের আঘাতে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে শাহাদতবরণ করেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনি বলেন, একইসঙ্গে শহিদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেল, একমাত্র সহোদর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, কৃষকনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল হক মণিসহ অনেক নিকট-আত্মীয়।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫ই আগস্টের সব শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

তিনি বলেন, বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা ও মহান স্বাধীনতার রূপকার বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। ১৯৪৮ সালে ভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২'র মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮'র সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২'র গণবিরোধী শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬'র ছয় দফা, ১৯৬৯'র গণ-অভ্যুত্থান ও ১৯৭০'র নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বার বার কারাবরণ করতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে অমানবিক নির্যাতন।

তিনি বলেন, মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধিকারের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপোশহীন। ফাঁসির মঞ্চেও তিনি বাংলা ও বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু অসীম সাহসিকতার সঙ্গে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর ওই ভাষণে বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে গেথে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', যা ছিল মূলত স্বাধীনতারই ডাক।

তিনি বলেন, এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। ঘাতকচক্র জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তাঁর নীতি ও আদর্শকে মুছে ফেলতে পারেনি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতির পিতার নাম এ দেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অমলিন, অক্ষয় হয়ে থাকবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বঙ্গবন্ধু আজীবন সাম্য, মৈত্রী, গণতন্ত্রসহ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি ছিলেন বিশ্বে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের স্বাধীনতার প্রতীক, বাঙালির মুক্তির দূত। ১৯৭৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর আলজিয়ার্সে

জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত– শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে'।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের অনন্য মাইলফলক পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল ইতোমধ্যে জনগণের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। পায়রা সমুদ্রবন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, কর্ণফুলী টানেলসহ আরও কয়েকটি মেগা প্রকল্পের কাজ খুব শিগগিরই শেষ হবে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হবে। সে লক্ষ্যে জ্ঞান-গরিমায় সমৃদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করাই এখন আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। তাহলেই চিরঞ্জীব এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

বঙ্গবন্ধু অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও অর্থনৈতিক সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাঙালি ও বাংলাদেশ একে অপরের পরিপূরক এবং অভিন্ন সত্তা। তিনি বলেন, মানবিক বঙ্গবন্ধু অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও অর্থনৈতিক সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। রাষ্ট্রপ্রধান ২৬শে আগস্ট বঙ্গভবনের দরবার হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত অ্যানিমেশন মুভি '*মুজিব ভাই*' প্রদর্শনের পূর্বে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, জীবন-কর্ম, ত্যাগ-তিতিক্ষা সবগুলো মানবীয় গুণাবলির সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন অনন্য বাঙালি। বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ– ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপের সবগুলো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ লাভ করে, তাঁকে করে তুলেছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও অন্যান্য মানবিক গুণাবলির সমন্বয়ের এক অনন্য মানুষ।

তিনি বলেন, তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন নাটকীয়তা, মানবিক গুণাবলি, তাঁর শৈশব ও কৈশোরের মানবিক কর্মকাণ্ড সবকিছুর সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক অনন্য বাঙালি। রাষ্ট্রপতি বলেন, বঙ্গবন্ধু কতটা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর প্রমাণ তিনি কলকাতায় দাঙ্গার সময়ও দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি আশা করেন যে, আইসিটি বিভাগ নির্মিত *মুজিব ভাই* অ্যানিমেশন মুভি জাতির পিতার জীবন ও কর্ম এবং আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হবে। *মুজিব ভাই* অ্যানিমেশন মুভিটি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' থেকে 'স্মার্ট বাংলাদেশে' রূপান্তরের একটি প্রয়াস উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি মুভিটির পরিচালক, প্রযোজক, কলাকুশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

তিনি আশা করেন যে, আইসিটি বিভাগ তাদের নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, প্রসার ও ব্যবহারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাসকে তুলে ধরতে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালাবেন এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও স্মার্ট দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অ্যানিমেশন একটি মজাদার ও শক্তিশালী মাধ্যম, যা কার্টুন, চলচ্চিত্র ও গেমিং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অবাধে কাহিনি বলার সাথে সাথে কাল্পনিক চিত্রকর্ম, স্পেশাল ইফেক্ট, আলোকায়ন, সংগীত ও কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে বিষয়বস্তুর সত্যিকারের আত্মপ্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে অ্যানিমেশন। এটি বিজ্ঞান, চারুকলা, কৌতুক, সাহিত্য, সংগীত এবং আরও অনেক বিষয়ে একটি শক্তিশালী সমন্বিত সাধনার পূর্ণাঙ্গ রূপ। *মুজিব ভাই* মুভিটিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনযাত্রা, সংগ্রাম এবং দেশের মানুষের মধ্যে তাঁর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা এবং মর্মস্পর্শী প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

প্রতিবেদন: মিতা খান

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্রবাহিনীকে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা কারও সাথে যুদ্ধ চাই না, বরং শান্তিতে থাকতে চাই। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে। ৩রা সেপ্টেম্বর ২০২৩ নৌবাহিনী প্রধানের সচিবালয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী সিলেকশন বোর্ড ২০২৩-এ ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী দেশের সশস্ত্রবাহিনীকে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, প্রতিটি দেশের সাথে আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু আমরা জাতির পিতার দেওয়া নীতি অনুসরণ করছি, তাই আমরা সবার সাথে সমানভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখছি। কারণ আমাদের লক্ষ্য দেশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা।

জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্রবাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়'– পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এসময় প্রধানমন্ত্রী নৈতিকতা, ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে জ্ঞান, দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দায়িত্ববোধ ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জন্য বাছাইয়ে বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করার জন্য নির্বাচন বোর্ডকে নির্দেশ দেন।

প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭টি প্রকল্প অনুমোদন

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭টি প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। গত ৫ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সভাকক্ষে একনেক চেয়ারপার্সন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এই প্রকল্পের

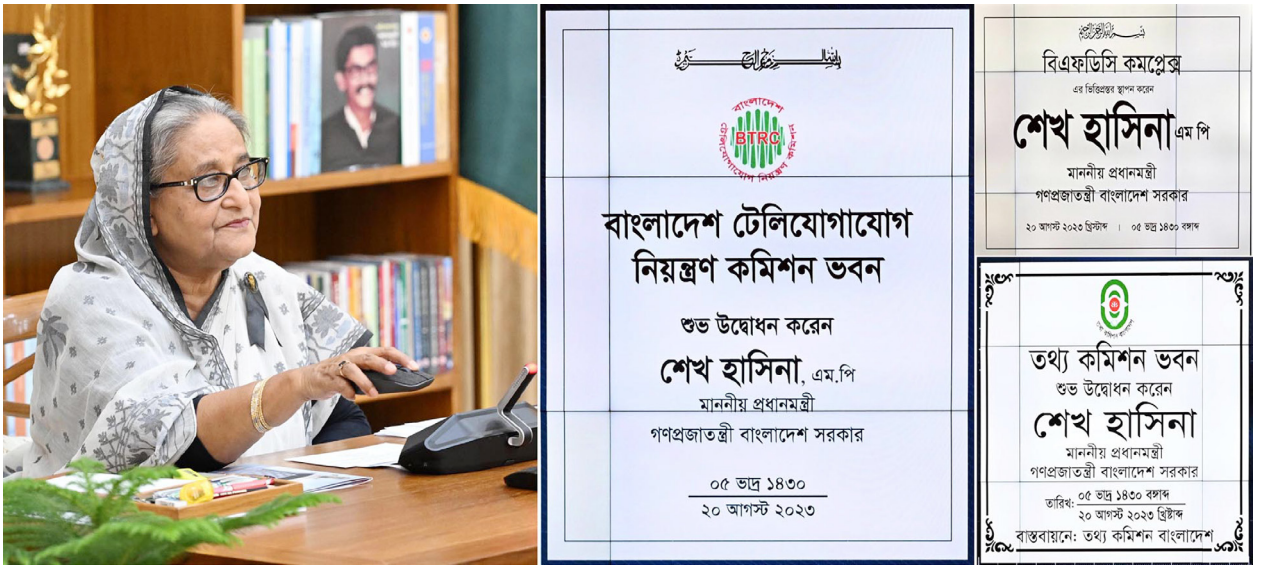

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে আগস্ট ২০২৩ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন' ও 'তথ্য কমিশন'– এর নবনির্মিত ভবন এবং 'বিএফডিসি কমপ্লেক্স' ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন– পিআইডি

অনুমোদন দেওয়া হয়। সভা শেষে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত জানান।

পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে ১২ হাজার ৯৫১ কোটি টাকা ৫১ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারি তহবিল থেকে ১০ হাজার ২৬৭ কোটি ৫২ লাখ টাকা, বৈদেশিক ঋণ থেকে পাওয়া যাবে ২ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে পাওয়া যাবে ১৩ কোটি ৮৪ লাখ টাকা।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অগ্নিসন্ত্রাসের মতো মানুষের তৈরি দুর্যোগ মোকাবিলা করেও আমরা উন্নয়নের পথে দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে চাই। তিনি জানান, তাঁর সরকার চায় বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। ২০শে আগস্ট গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নবনির্মিত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ভবন ও তথ্য কমিশন ভবন উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এছাড়া একইসঙ্গে তিনি ভার্চুয়ালি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (বিএফডিসি) কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণ আমাদের বার বার নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে তাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন বলেই এ কাজগুলো আমরা করতে পেরেছি। বাংলাদেশে ২০০৯ সাল থেকে আজ ২০২৩ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার চলছে, দেশে স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। তিনি বলেন, আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে এ বাংলাদেশকে আমরা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সেখানে আমাদের স্মার্ট জনগোষ্ঠী হবে, স্মার্ট ইকোনমি হবে, স্মার্ট সোসাইটি হবে, স্মার্ট গভর্নমেন্ট তথা প্রতিটি ক্ষেত্রই স্মার্ট হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ' প্রকল্পের কাজ ২০২৪ সালে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। হাতিরঝিল প্রকল্পের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পটির ভূমি ব্যবহার করা হচ্ছে। কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ফ্লোরে সব ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে যাতে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তা প্রদর্শন করার সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

ব্রিকসকে হতে হবে বহুমুখী বিশ্বের বাতিঘর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ব্রিকসকে বহুমুখী বিশ্বের বাতিঘর হিসেবে আবির্ভূত হতে হবে এবং প্রতিক্রিয়ার সময় অন্তর্ভুক্তিমূলক প্ল্যাটফর্ম হতে হবে। তিনি বলেন, আমরা আশা করি– আমাদের প্রতি প্রতিক্রিয়ার সময় এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আবির্ভূত হবে। আমাদের শিশু ও যুবকদের কাছে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে– আমাদের জাতিগুলো সংকটে পড়তে পারে, কিন্তু কখনই পরাজিত হবে না। গত ২৪শে আগস্ট জোহানেসবার্গের স্যান্ডটন কনভেনশন সেন্টারে ৭০টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে ফ্রেন্ডস অব ব্রিকস লিডারস ডায়ালগ (ব্রিকস-আফ্রিকা আউটরিচ অ্যান্ড দ্য ব্রিকস প্লাস ডায়ালগ) 'নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব ব্রিকস'-এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে ভাষণ প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমান ব্রিকস চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার আমন্ত্রণে ১৫তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ২২শে আগস্ট জোহানেসবার্গে পৌঁছান।

বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, টেকসই উন্নয়নে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতি। আমরা ২০০৬ সালে ৪১.৫% থেকে দারিদ্র্য কমিয়ে ২০২২ সালে ১৮.৭%-এ নিয়ে এসেছি। আমরা একই সময়ে চরম দারিদ্র্য

২৫.১% থেকে ৫.৬% কমিয়েছি। তিনি বলেন, তাঁর সরকার সবার ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করেছে এবং বিনামূল্যের সামাজিক আবাসন প্রকল্প আশ্রয়ণের অধীনে গৃহহীনতার অভিশাপ দূর করতে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার সারা দেশে ডিজিটাল গণ-অবকাঠামো তৈরি করেছে। আমাদের জনসংখ্যার প্রায় ১০৮% সেলুলার মোবাইল সংযোগে এক্সেস আছে, যা বিশ্বব্যাপী গড় থেকে বেশি। গত অর্থবছরে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেমস ১১১.২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের লেনদেন রেকর্ড করেছে। এতে অন্যদের সঙ্গে আমাদের গ্রামীণ নারীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেশি এবং গড় আয়ু প্রায় ৭৩ বছর।

তিনি আরও বলেন, গত সপ্তাহে (১৭ই আগস্ট) আমরা ১০০ মিলিয়ন মানুষের জন্য সার্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করেছি, যেখানে সমস্ত লেনদেন অনলাইনে হয়। সরকারি কর্মীরা পেনশন সুবিধা ভোগ করে। আমাদের সরকারের পরবর্তী লক্ষ্য হলো ২০৪১ সালের মধ্যে একটি 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলা। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখাসহ দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিস্থিতি বক্তব্যে তুলে ধরেন।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

চলচ্চিত্র শিল্প স্বাধীনতার পর দেশ গঠনেও অবদান রেখেছে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে অবদান রেখেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রেখেছে, স্বাধীনতার পর দেশ গঠনেও অবদান রেখেছে। তিনি বলেন, সিনেমা নির্মাণের সাথে যারা যুক্ত তারা জানেন, বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর চলচ্চিত্র নির্মাতাদের দেশ গঠনের লক্ষ্যে সিনেমা নির্মাণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তখন *আবার তোরা মানুষ হ, ওরা এগারো জন*– এমন সিনেমা নির্মিত হয়েছে, যেগুলো দেশ গঠনে অবদান রেখেছে। ২৪শে আগস্ট রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএফডিসি) জহির রায়হান কালার ল্যাব মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র লীগ আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু ও রাজনীতি প্রসঙ্গে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, রাজনীতিবিদ যদি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে হয়ত ক্ষমতায় যায়, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় না। বঙ্গবন্ধু কখনো ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করেননি। সবসময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সে কারণে বঙ্গবন্ধু যেমন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, তেমনি দেশমাতৃকার তরে যারা রাজনীতি করে বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে তাদের অনেক কিছু শেখার আছে। রাজনীতি একটি ব্রত, দেশসেবা, মানবসেবা, সমাজসেবার ব্রত। তিনি বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য, বেশির ভাগ রাজনীতিবিদ সেটা মনে করেন না, মনে রাখেন না। এটিই আজকের দিনের বাস্তবতা।

শেখ মুজিবুর রহমান থেকে জাতির পিতা আলোকচিত্র সংকলন এবং *রক্তাক্ত মাগুরা: প্রেক্ষিত-মুক্তিযুদ্ধ* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২৩শে আগস্ট সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতর সম্মেলন কক্ষে *শেখ মুজিবুর রহমান থেকে জাতির পিতা* আলোকচিত্র সংকলন এবং *রক্তাক্ত মাগুরা : প্রেক্ষিত-মুক্তিযুদ্ধ* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার খালেদা বেগম, গ্রন্থকার বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুন নাহার, মোহাম্মদ নাছিমুল কামাল, প্রকাশক আবু হাশেম প্রমুখ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

রক্তাক্ত মাগুরা : প্রেক্ষিত-মুক্তিযুদ্ধ গ্রন্থের লেখিকা বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুন নাহারকে ধন্যবাদ জানান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। তিনি বলেন, জেলাভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এক অনন্য দলিল। শামসুন নাহারের লেখা গ্রন্থটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। পাশাপাশি *শেখ মুজিবুর রহমান থেকে জাতির পিতা* গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ কিছু আলোকচিত্র সংকলনের জন্য নাছিমুল কামালকেও ধন্যবাদ জানান তিনি।

আগস্ট মাস বাঙালির বেদনাবিধুর মাস

আগস্ট মাসকে বাঙালি জীবনের বেদনাবিধুর মাস হিসেবে বর্ণনা করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। তিনি বলেন, এই আগস্ট মাসেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। এই আগস্ট মাসেই মহাপ্রয়াণ ঘটেছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, মৃত্যুবরণ করেছেন দ্রোহের কবি, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এই আগস্ট মাসেই ফাঁসির মঞ্চে নিজ গলায় দড়ি পরিয়েছেন ক্ষুদিরাম বসু। ১৫ই আগস্ট রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। ডিএফপির মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া সভায় বক্তব্য দেন।

আগস্ট মাস এলেই স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি, জঙ্গিগোষ্ঠী তৎপর হয় উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে, ২১শে আগস্ট বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড হামলা পরিচালনা করা হয়েছে। ১৭ই আগস্ট সারা দেশে পাঁচশো জায়গায় বোমা ফাটানো হয়েছে। তিনি বলেন, বাঙালি জীবনের বেদনাবিধুর এই মাস এলেই বাঙালিবিরোধী, বাঙালিত্ববিরোধী, আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিবিরোধী, দেশবিরোধী অপশক্তি তৎপর হয়। সে জন্য আমাদের সবার সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আর দেশকে এগিয়ে নিতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২৩শে আগস্ট ২০২৩ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে 'শেখ মুজিবুর রহমান থেকে জাতির পিতা' এবং 'রক্তাক্ত মাগুরা: প্রেক্ষিত-মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন– পিআইডি

শেখ মুজিব থেকে জাতির পিতা হওয়ার পেছনে বঙ্গমাতা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ১১ই আগস্ট ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সভায় অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু, তাঁর স্ত্রী বঙ্গমাতা ও তাঁদের পরিবারের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা হয়ে ওঠার পেছনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের অবদান অসামান্য। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনে বহুবার বহু সময় কারাগারে কেটেছে। তিনি যখন কারাগারের বাইরে থাকতেন, বঙ্গমাতা তখন সংসার সামলেছেন আর বঙ্গবন্ধু যখন কারাগারে থাকতেন, তখন বঙ্গমাতা দল এবং সংসার দুটোই সামলেছেন।

সারা জীবন সাধারণ নারীর মতো জীবনযাপনকারী নিভৃতচারী মহীয়সী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষণগুলোতে কীভাবে তাঁর স্বামী বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড়িয়েছেন, সেগুলো আমরা বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন লেখা ও আলোচনা থেকে জানতে পারি উল্লেখ করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। তিনি বলেন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন এবং তাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দেন। বঙ্গবন্ধু নিজেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং রাওয়ালপিন্ডি থেকে টেলিফোনে সেটি বঙ্গমাতাকে জানান। বঙ্গমাতাও একইমত পোষণ করেন ও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য বঙ্গবন্ধুকে ধন্যবাদ দেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার লোভ করেননি, প্রধানমন্ত্রী হতে চাননি, বাংলার স্বাধীনতার পথে এগিয়ে গেছেন, বঙ্গমাতা পরিবার নিয়ে তাঁর সাথে থেকেছেন। বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির মঞ্চে নেওয়া হয়েছে, জাতির দিকে তাকিয়ে বঙ্গমাতা অবিচল থেকেছেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের দিনও বঙ্গমাতা তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা, সদ্যজাত শিশু জয়, শেখ রেহানা, শেখ রাসেলসহ পাকিস্তানিদের হাতে বন্দিত্ব সহ্য করেছেন। এমনকি মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে প্রথমে তাঁর পরিবারের কাছে নয়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জনতার কাছে গেছেন স্মরণ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু প্রমাণ করেছেন, সত্যিকারের রাজনীতিকের কাছে জনতাই প্রথম, পরে পরিবার এবং পরিবার তা মেনে নেয় ও পাশে থাকে।

স্মার্ট সমাজের পথে এগিয়ে নিচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের বিকাশ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ফলে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বজনীন প্রসার ও গণমাধ্যমের যুগান্তকারী বিকাশ আমাদেরকে স্মার্ট সমাজের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ৪ঠা আগস্ট রাজধানীর আফতাব নগরে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি আয়োজিত ৩য় আন্তর্জাতিক 'তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা' সম্মেলন উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। মন্ত্রী এসময় 'স্মার্ট সমাজে সকলের যথাযথ তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ' (ইনক্লুসিভ অ্যান্ড ইকুইটেবল এক্সেস টু ইনফরমেশন ফর স্মার্ট সোসাইটি)–প্রতিপাদ্য নিয়ে এ সম্মেলন আয়োজনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিশ্বাস করে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ ডিজিটাল এবং গত সাড়ে ১৪ বছরে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমের বিকাশ অভূতপূর্ব। দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য সেবাকেন্দ্র, দেশব্যাপী ইন্টারনেট সংযোগ, মানুষ একাধিক সিমকার্ড ব্যবহারের কারণে ১৭ কোটি মানুষের হাতে ১৮ কোটি মোবাইল সিমকার্ড বিশ্বজগতের তথ্য ও জ্ঞানকে সহজলভ্য করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই তথ্য ও জ্ঞানকে বিবেচনা ও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারলে জীবন আরও সমৃদ্ধ হবে।

উল্লেখ্য, তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলনে দেশের গবেষকদের সাথে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং বসনিয়া-হার্জেগোভিনার গবেষকসহ ১৩টি দেশের প্রায় ৪০০ অংশগ্রহণকারী যোগ দেয়।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

পাটের রঙিন সুতা রপ্তানি হচ্ছে

পাট বা জুট থেকে উৎপাদিত রঙিন সুতা রপ্তানি হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। আর এই সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়েছে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় অবস্থিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কর্ণফুলী জুট মিল। ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

প্রায় ৪৭ একর জায়গাজুড়ে প্রতিষ্ঠিত এই কারখানায় বর্তমানে এক হাজারেরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করছেন। এখানে দুই শিফটে জুট থেকে দৈনিক ৩০ টনের বেশি সুতা উৎপাদিত হয়। এসব সুতা রপ্তানি হয় চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, তুর্কি, ইরানসহ বিশ্বের প্রায় ১২টি দেশে। গত অর্থবছরে এই কারখানা থেকে সুতা রপ্তানি করে ৮৫ লাখ মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। সুতা উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছ থেকে পাট সংগ্রহ করা হয়। উপযুক্ত মূল্য পরিশোধে পাট সংগ্রহের ফলে প্রান্তিক কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন। পাটের সোনালি দিন ফিরিয়ে আনতেই এমন উদ্যোগ।

পাঁচ বছর মেয়াদি ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু

স্বয়ংক্রিয়ভাবে (অনলাইনে) পাঁচ বছর মেয়াদি ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস। ৪ঠা সেপ্টেম্বর মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে (এমসিসিআই) এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন তিনি। এর মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে আমরা এখন আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে গেছি। ব্যবসায়ীদের হয়রানি বন্ধে ট্রেড লাইসেন্স পাঁচ বছরের জন্য দেওয়া হবে। দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাভুক্ত ও বিডার আওতায় যেসব ব্যবসায়ী কাজ করবেন সবাই এই সুফল পাবেন।

রপ্তানিতে ৪৩টি পণ্য নগদ সহায়তা পাবে

বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ জানায়, চলতি অর্থবছরে ৪৩টি পণ্য ও খাতকে রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি বা নগদ সহায়তা দেওয়া হবে। গত অর্থবছরের মতো এবারও ১ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ হারে এই নগদ সহায়তা পাবেন পণ্যগুলোর রপ্তানিকারকরা। ২৪শে আগস্ট এ সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ। সার্কুলারের নির্দেশনা অনুযায়ী, চলতি বছরের ১লা জুলাই থেকে আগামী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে ৪৩টি পণ্য রপ্তানির বিপরীতে প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা পাবে। গতবারও এই ৪৩টি পণ্য সহায়তা পেয়েছিল।

পূর্ববর্তী বছরগুলোর মতো চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরেও রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তার আবেদনপত্র বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিয়োজিত অডিট ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করানো যাবে। তবে নিরীক্ষা কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ফার্ম নিয়োগের প্রয়োজন হলে সে বিষয়ে যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ অডিট ফার্মের সংখ্যা উল্লেখ করে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর আবেদন করতে হবে।

সর্বোচ্চ নগদ সহায়তা পাওয়া খাতগুলো হলো– আলু, শস্য বীজ, সবজি বীজ, আগর, আতর, পাটকাঠি থেকে তৈরি কার্বন ও জুট পার্টিকেল বোর্ড রপ্তানি। এসব খাতে ২০ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা দেওয়া হবে। সর্বনিম্ন ১ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা দেওয়া হবে বস্ত্র খাতের বিশেষ রপ্তানির বিপরীতে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডাটা সম্পদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা জরুরি

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, ডিজিটাল ডাটা সোনার চেয়েও দামি। মূল্যবান ডাটা সম্পদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা জরুরি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ফলে কাগজের তথ্য এখন ডাটায় রূপান্তরিত হচ্ছে। ডাটা সংরক্ষণ ও সুরক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী। ২১শে আগস্ট টেলিকম অ্যান্ড টেকনোলজি রিপোর্টার্স নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের (টিআরএনবি) উদ্যোগে আয়োজিত ক্লাউড কম্পিউটিং বিষয়ক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে এক সময় ক্লাউড বলতে কোনো ধারণা ছিল না। এখন সবকিছু ডিজিটাল হয়ে গেছে, এখন ক্লাউডের কোনো বিকল্প নেই। সাংবাদিকদের এসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ সাংবাদিকদের ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের আয়োজিত এই কর্মশালা নিজেদের স্মার্ট হওয়ার সুযোগ তৈরিতে কার্যকর অবদান রাখবে।

মন্ত্রী বলেন, জ্ঞান হলো পৃথিবীর বড়ো সম্পদ। স্মার্ট বাংলাদেশ হলো জ্ঞানভিত্তিক সাম্য সমাজ। স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় জ্ঞানভিত্তিক সাম্য সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে মেধা ও যোগ্যতা কাজে লাগাতে হবে। ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের গুরুত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ডাটা আমাদের ব্যবহার করতেই হবে। এটি আমাদের সম্পদ, সুতরাং এটি যেখানে রাখতে হবে সেই জায়গাটি হতে হবে নিরাপদ।

কর্মশালায় জানানো হয়, বাংলাদেশেও নিজেদের ক্লাউড তৈরি করে ব্যবহার করা সম্ভব। এ কাজে দেশীয় প্রতিষ্ঠান এ ক্লাউড প্লানেট

তাদের চারটি ডেটা সেন্টার স্থাপন করেছে ঢাকা, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামে। সেখানেও ব্যবহার করা হয়েছে ওপেনস্টেক ক্লাউড।

গত পাঁচ বছরে তারা প্রায় ১০ লাখ মানুষকে সেবা দিয়েছে। কর্মশালায় বক্তারা তুলে ধরেন, কীভাবে এই দেশীয় ক্লাউড ব্যবহার করে ডলার সাশ্রয় করা সম্ভব। কারণ দেশীয় ক্লাউড ব্যবহারে বিদেশি সফটওয়্যার বা সেসবের নিরাপত্তার জন্য বাড়তি কোনো সেবার প্রয়োজন নেই।

এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো ফ্রিল্যান্সার কনফারেন্স

অনুষ্ঠিত হলো ফ্রিল্যান্সারদের নিয়ে এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো সম্মেলন 'ন্যাশনাল ফ্রিল্যান্সারস কনফারেন্স'। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো ফ্রিল্যান্সার কমিউনিটি 'ফ্রিল্যান্সার অব বাংলাদেশ'-এর আয়োজনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশ নেওয়া মোট ৩ হাজার ফ্রিল্যান্সারের অংশগ্রহণে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে আগস্ট রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরাতে (আইসিসিবি) এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, ফ্রিল্যান্সার হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন। ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষণের সুযোগ কাজে লাগিয়ে মধুপুরের দুর্গম পাহাড়ের গায়রা গ্রামের একজন তরুণ গোটা এলাকার জীবন ধারা পাল্টে দিয়েছে। তাদের উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়ার পর ওই গ্রামের তিন শতাধিক ছেলেমেয়ে প্রত্যন্ত পাহাড়ে বসে প্রতিমাসে কয়েক হাজার ডলার আয় করছে। একই অবস্থা সুনামগঞ্জের ধর্মপাশার আহমেদপুর গ্রামে। হাওরের এই প্রত্যন্ত গ্রামে এখন ৪৮ জন প্রোগ্রামার আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে।

সকাল ৯টা থেকে শুরু হয় এই কনফারেন্স। এরপর গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও)সহ নানা বিষয়ে প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দেশসেরা ১৫ জন ফ্রিল্যান্সারদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে বুদ্ধিদীপ্ত-উদ্ভাবনী জাতি

২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সাফল্যের পথ ধরে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কার্যক্রম শুরু করেছে সরকার। যার লক্ষ্য ২০৪১ সাল নাগাদ বিশ্বে বাংলাদেশকে বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে তুলে ধরা। ৩০শে আগস্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের এনহ্যান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি (ইডিজিই) প্রকল্পের সঙ্গে বেসিস ও বাক্কোর দুটি আলাদা সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়। বাংলাদেশ কম্পিউটার

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ১৯শে আগস্ট ২০২৩ ঢাকায় বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন হলে ন্যাশনাল ফ্রিল্যান্সারস কনফারেন্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

কাউন্সিল (বিসিসি) মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এ প্রকল্পে অর্থায়ন করছে বিশ্বব্যাংক। সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের রিজিওনাল ডিরেক্টর পঙ্কজ গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। ইডিজিই প্রকল্প পরিচালক নাহিদ সুলতানা মল্লিক, বেসিস সভাপতি রাসেল টি আহমেদ এবং বাক্কো সভাপতি ওয়াহিদ শরীফ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, উদ্ভাবন ও গবেষণার বিকাশে দেশের ১০টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার গবেষণা ও উদ্ভাবন কেন্দ্র (আরআইসি) প্রতিষ্ঠা করছে। এসব আরআইসি থেকে অগ্রসর প্রযুক্তিনির্ভর নানা গবেষণা ও উদ্ভাবনের ফলে দেশে উদ্যোক্তা তৈরি হবে, যারা বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, সরকার চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, বিগডেটা, ব্লকচেইন, থ্রিডির মতো অগ্রসর প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করছে। এজন্য ইডিজিই প্রকল্প থেকে এসব প্রযুক্তিতে এক লাখ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

জানা গেছে, নীতি সহায়তা প্রদান, অধিকতর দক্ষতা উন্নয়ন, সরকারি ও বেসরকারি খাতে ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় উদ্ভাবকদের একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলার মাধ্যমে ডিজিটাল অর্থনীতিবান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে সরকার আইসিটি শিল্পের জন্য দুটি ডিজিটাল অর্থনীতি হাব (কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী, ব্যবসায়িক সংস্থাগুলোর দক্ষতা ও নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল অর্থনীতি কেন্দ্রগুলোকে (হাব) গতিশীল উদ্ভাবন, জ্ঞান বিতরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষগুলো কাজ করবে। ডিজিটাল অর্থনীতির অংশীজনের জন্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সম্পর্কিত কনটেন্ট তৈরির পাশাপাশি জ্ঞান ও সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবে।

শ্রমনির্ভর শিল্প ছেড়ে আইটিতে ক্যারিয়ার গড়ছে তরুণরা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, দেশের স্বল্প শিক্ষিত তরুণরা কর্মসংস্থানের জন্য এক সময় গার্মেন্টসসহ শ্রমনির্ভর শিল্পের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এখন তারা আইটি শিল্পে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ে তুলছে। ৯ই আগস্ট রাজধানীর কাওরান বাজারে 'ভিশন–২০৪১ স্মার্ট টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় আইসিটি বিভাগে 'ডিজিটাল উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবন ইকো-সিস্টেম উন্নয়ন' এবং 'এনহ্যান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি' নামে দুটি পৃথক প্রকল্প চলমান। দেশে ইনোভেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগের গতি বৃদ্ধি করতে ডিজিটাল উদ্যোক্তা তৈরি করছে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। ফলে তরুণ প্রজন্ম চাকরি খোঁজার পরিবর্তে চাকরি সৃষ্টির প্রতি অধিক মনোযোগী হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, স্টার্টআপ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশের হার বাড়ানো এবং জেন্ডার ইনক্লুসিভ ডিজিটাল এন্টারপ্রেনারশিপ তৈরি করা এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। খুব দ্রুতই এ স্মার্ট টাওয়ারের নির্মাণকাজ শেষ হয়ে যাবে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

ডিজিটাল নথিতে যুক্ত হলো আরও ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

পেপারলেস অফিস প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে দ্বিতীয় ধাপে ডি-নথির (ডিজিটাল নথি) সঙ্গে যুক্ত হলো দেশের আরও ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই নিয়ে ১৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি-নথি কার্যক্রম শুরু হলো। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) ১৩ই আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-নথি কার্যক্রম উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ডি-নথির মাধ্যমে যে-কোনো স্থান থেকে ফাইল নিষ্পত্তি করা যায়। ফলে কোনো ফাইল আটকে থাকছে না, বাড়ছে কাজের গতি। এতে দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে এবং দুর্নীতির সুযোগ কমে যাচ্ছে। তিনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ডি-নথি কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান। তিনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি-নথি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ইউজিসিকে ধন্যবাদ জানান।

শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, ডি-নথির ব্যবহারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা বাড়বে। তিনি সবাইকে গতানুগতিক মানসিকতা পরিহার করে ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুমে পাঠদানের বাইরে আইসিটি অবকাঠামো বিষয়ে বাস্তবজ্ঞান প্রদান এবং নিজেদের

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ডি-নথির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতের পরামর্শ দেন। উপমন্ত্রী আরও বলেন, ইউজিসির আইনি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে ইউজিসি চেয়ারম্যান কাজী শহীদুল্লাহ বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণ করছি। ডিজিটাল নথি বাস্তবায়ন করা গেলে ফাইলের স্তূপ কমবে, সেবাপ্রত্যাশীরা স্মার্ট সেবা পাবে এবং ভোগান্তি কমে যাবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ডিজিটাল নথি বাস্তবায়নে আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ দেন।

স্কুল-কলেজের টিউশন ফি নির্ধারণ করবে সরকার

সারা দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলো ইচ্ছেমতো টিউশন ফি নিয়ে থাকে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিমাত্রায় টিউশন ফি আদায়ের অভিযোগ রয়েছে অভিভাবকদের। এমন পরিস্থিতিতে একটি যৌক্তিক টিউশন ফি নির্ধারণ করতে যাচ্ছে সরকার।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি সংক্রান্ত একটি খসড়া নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। ২৯শে আগস্ট সংবাদ মাধ্যমে এ খবর প্রকাশিত হয়।

অভিযোগ রয়েছে, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য টিউশন ফি নির্ধারণে পৃথক কোনো নীতিমালা না থাকায় অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে ইংলিশ মিডিয়াম বা ইংলিশ ভার্সন পরিচালনাকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্বাভাবিক হারে টিউশন ফি আদায় করে থাকে।

আবার পুনঃভর্তি ফি বাতিল করা হলেও বিভিন্ন নামে এই ফি আদায় করছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। এভাবে শিশুদের শিক্ষা ব্যয় অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ার কারণে চাপে পড়ছেন অভিভাবকরা।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

ফোর্বস-এর অনূর্ধ্ব ৩০ সফল তরুণ নেতার তালিকায় বাংলাদেশের নবনীতা

কানাডার টরন্টোর অনূর্ধ্ব-৩০ বছর বয়সি সফল ৩০ তরুণ নেতার তালিকায় স্থান পেয়েছেন কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশি গবেষক ও উদ্যোক্তা নবনীতা নাওয়ার। এই তালিকায় একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে তিনি স্থান পেয়েছেন। বিশ্বখ্যাত সাময়িকী *ফোর্বস* ৯ই আগস্ট প্রথমবারের মতো ৩০ সফল তরুণ নেতার তালিকা প্রকাশ করেছে। টরন্টোকেন্দ্রিক প্রথম এই তালিকায় আর্থিক, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, ক্রীড়া ও কলা ক্ষেত্রে সফল তরুণদের নির্বাচিত করা হয়েছে।

এই তালিকা প্রকাশ করে *ফোর্বস* বলেছে, ৩০ বছরের কম বয়সি টরন্টোর ৩০ তরুণ নেতার কেউ সহায়তা করেন শহরে নিরাপদ ড্রোন চলাচলে, কেউ উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে বিকল্প প্লাস্টিক বানান, আবার কেউ লেখা শনাক্তকারী নির্মাণসামগ্রী তৈরি করেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। এইচড্যাক্স থেরাপিউটিকসের সহপ্রতিষ্ঠাতা ২৮ বছর বয়সি বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের মেয়ে নবনীতা নাওয়ার বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। যেসব রোগের ওষুধ এখনো নেই, সেই সব ওষুধ আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে কাজ করছে এই প্রতিষ্ঠান।

বর্ণবৈষম্যবিরোধী বৈশ্বিক চ্যাম্পিয়ন হলেন রানি ইয়েন ইয়েন

'বর্ণবৈষম্যবিরোধী বৈশ্বিক চ্যাম্পিয়ন ২০২৩' পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশের চাকমা নৃগোষ্ঠীর মেয়ে মানবাধিকারকর্মী রানি ইয়েন ইয়েন। ৯ই আগস্ট মনোনীতদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, নিজের সম্প্রদায়ের ঝুঁকি ও দুর্দশার চিত্র বিশ্ব সম্প্রদায়ের নজরে আনতে সম্মত হয়েছেন ইয়েন ইয়েন। তিনি বাংলাদেশে নারী অধিকার ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর আরও জানিয়েছে, রানি ইয়েন ইয়েন বাংলাদেশে মারমা নেতা হিসেবে কাজ করছেন। রাষ্ট্রীয় বৈষম্য, ভূমি দখল, সহিংসতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় দরিদ্র মানুষকে নিয়ে কাজ করছেন তিনি। লৈঙ্গিক সমতা, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থায় পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন রানি ইয়েন ইয়েন। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিয়েও গবেষণা করছেন তিনি। এছাড়া তিনি বৈচিত্র্য এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে যুব সম্প্রদায়ের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছেন। উল্লেখ্য, রানি ইয়েন ইয়েন ছাড়া এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত অন্যরা হলেন ব্রাজিল, তিউনিসিয়া, পেরু, নেপাল ও মলদোভার অধিকারকর্মী।

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে নারী-পুরুষ সমান

দেশে এজেন্ট ব্যাংকিং শুরুর ৯ বছরে নারী-পুরুষ ব্যাংক হিসাবধারীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান। এ বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে । প্রতিবেদনটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে মোট হিসাবধারীর সংখ্যা ১ কোটি ৮৯ লাখ ৩৪ হাজার ১৫৩। এরমধ্যে প্রায় ৪৯ শতাংশ নারী ব্যাংক হিসাবধারী ও ৪৯.৬ শতাংশ পুরুষ হিসাবধারী। বাকি ১ শতাংশের বেশি হিসাবধারী অন্য লিঙ্গের ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ নারী হিসাবধারী ৯৩,১৩,৪৮০ জন আর পুরুষ হিসাবধারী ৯৪,০৭,৮১৭ জন।

প্রতিবেদন অনুসারে, আগের ত্রৈমাসিকের (২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত) তুলনায় এই ত্রৈমাসিকে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে নারী হিসাবধারী ১০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। ফলে পুরুষের সঙ্গে নারী হিসাবধারীর পার্থক্য কমে প্রায় সমান হয়ে গেছে। এক বছরে নারী হিসাবধারী বেড়েছে ২৫ শতাংশ। এ তথ্য বলছে, আনুষ্ঠানিক আর্থিক লেনদেন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

৮ অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

কানাডায় শুল্কমুক্ত সুবিধা আরও ১০ বছর বাড়ল

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে কানাডার বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা আরও ১০ বছর পাচ্ছে বাংলাদেশ। দেশটিতে সম্প্রতি নতুন অর্থবিল অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তাতে ২০৩৪ সাল পর্যন্ত দেশটিতে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশকে কোনো শুল্ক দিতে হবে না। ২৭শে আগস্ট এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এসব তথ্য জানায়। এতে বলা হয়, জেনারেল প্রেফারেনশিয়াল ট্যারিফ (জিপিটি) স্কিমের আওতায় কানাডা উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে।

স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০০৩ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে কানাডার বাজারে কোটা ও শুল্কমুক্ত সুবিধা পেয়ে আসছে। এ সুবিধা জিপিটির আওতায় পড়ছে, যা প্রতি ১০ বছর পর পর নবায়ন করা হয়। জিপিটির বর্তমান সুবিধার মেয়াদ শেষ হবে ২০২৪ সালে।

মার্কিন ব্র্যান্ডের কাছে আকর্ষণীয় উৎস বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাকের শীর্ষ সরবরাহকারী হিসেবে এশিয়ার অবস্থান অক্ষুণ্ন আছে। পোশাক রপ্তানিকারক শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে সাতটিই এশিয়ার। এছাড়া দাম বিবেচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর কাছে তৈরি পোশাকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় উৎস বাংলাদেশ। চলতি মাসে মার্কিন ফ্যাশন মালিক সমিতি ইউনাইটেড স্টেটস ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের (ইউএসএফআইএ) এক গবেষণা জরিপে এই চিত্র উঠে এসেছে।

ইউএসএফআইএ'র শীর্ষ জরিপ প্রতিবেদন '২০২৩ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বেঞ্চমার্কিং স্টাডি' আগস্টের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। গত বছর এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ৩০টি ফ্যাশন ব্র্যান্ডের নির্বাহীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে এই জরিপ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, সামাজিক ও শ্রম বিষয়ে উপযুক্ত পরিবেশ বিবেচনায় বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোর মান বেশ উন্নত হয়েছে। রানা প্লাজা ধসের পর বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে সামাজিক দায়িত্বশীলতা চর্চার উন্নতি হয়েছে বলে জরিপে উঠে এসেছে।

ইউএসএফআইএ জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশের শীর্ষে আছে চীন, ভিয়েতনাম দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রেখেছে। বাংলাদেশের পর ভারতের অবস্থান। এছাড়া চীন, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় তৈরি পোশাক শিল্পের সার্বিক কর্মপরিবেশ নিয়ে অনেক আপত্তি উঠেছে। এসব বিষয়ে গত দুই বছরে বাংলাদেশ বেশ উন্নতি করেছে।

দামের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশের রেটিং ২০২২ সালের ২ থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ২.৫ হয়েছে। অন্যদিকে চীন ছাড়া এশিয়ার শীর্ষ সরবরাহকারী পাঁচটি দেশ (ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও কম্বোডিয়া) থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি নতুন উচ্চতায় উঠেছে। ২০১৯ সালের ৩৭.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৪.৩ শতাংশ হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যোগাযোগের আরেক মাইলফলক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধন দেশের যোগাযোগ খাতের জন্য আরেক মাইলফলক এবং এটি যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি বলেন, আমি ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট অংশের উদ্বোধন করেছি। এর অবশিষ্ট অংশের কাজ শিগগিরই শেষ হবে। ২রা সেপ্টেম্বর ২০২৩ রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে পুরাতন বাণিজ্য মেলা মাঠে আয়োজিত সুধী সমাবেশে ১১.৫ কিলোমিটার ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-ফার্মগেট অংশের উদ্বোধনকালে দেওয়া ভাষণে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক্সপ্রেসওয়ে চালু হওয়ায় ঢাকাবাসীর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। এক্সপ্রেসওয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে যানজট কমাতে বিরাট ভূমিকা পালন করবে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কুড়িল, মহাখালী, তেজগাঁও, ফার্মগেট, মগবাজার ও কমলাপুরের অন্তর্ভুক্ত ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ এলাকাগুলো যানজট নিরসনে ব্যাপক অগ্রগতির সাক্ষী হবে বলে তিনি মনে করেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের অবকাঠামোগত এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের খণ্ডচিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা মহাসড়কসহ মোট ৮৫৪ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ১০ হাজার ৮১০ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্ত করা হয়েছে। ১৯ হাজার ৮৯৯ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুত ও সার্ফেসিং এবং বিভিন্ন মহাসড়কে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৩১৬ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টোল পরিশোধের মাধ্যমে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে এক্সপ্রেসওয়েটি অতিক্রম করেন। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান তিনি।

ঢাকা-বরগুনা নদীপথে আবারও লঞ্চ চলাচল শুরু

যাত্রী সংকটের কারণে টানা ৯ দিন বন্ধ থাকার পরে পুনরায় লঞ্চ চলাচল শুরু হয় ঢাকা-বরগুনা নৌরুটে। ২৩শে আগস্ট ঢাকা থেকে শেষবারের মতো বরগুনার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসে লঞ্চ। এর ৯ দিন পর ৩১শে আগস্ট আবারও ঢাকা-বরগুনা রুটের লঞ্চ চলাচল শুরু হয়। এতে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফেরে যাত্রীদের মাঝে।

জানা যায়, জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি, যাত্রী সংকটের কারণে ২২শে আগস্ট থেকে ঢাকা-বরগুনা রুটের লঞ্চ চলাচল বন্ধ করে দেন মালিকপক্ষ। এ কারণে ভোগান্তিতে পড়েন ঢাকা-বরগুনা নৌরুটের সাধারণ যাত্রী ও ব্যবসায়ীরা। এরপর ভাড়ায় কিছুটা পরিবর্তন এনে ৩১শে আগস্ট থেকে আবার চালু হয় ঢাকা-বরগুনা নৌরুটের এমকে শিপিং লাইন্সের লঞ্চগুলো।

প্রতিবেদন : ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

লবণসহিষ্ণু উচ্চফলনশীল সয়াবিনের দুটি জাত উদ্ভাবন

লবণসহিষ্ণু উচ্চফলনশীল সয়াবিনের দুটি জাত উদ্ভাবন করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেমুরকৃবি) কৃষিতত্ত্ব বিভাগ। বিইউ সয়াবিন-৩ ও বিইউ সয়াবিন-৪ নামের নতুন জাতের এ সয়াবিন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। এছাড়া জাত দুটি

উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, হৃদরোগ, বিষণ্নতাসহ নানা রোগের জন্য উপকারী বলে দাবি করেছে গবেষক দল। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর এলাকা থেকে প্রায় ২০০ জার্মাপ্লাজম সংগ্রহ করে ২০০৫ সাল থেকে সয়াবিনের দুই জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল চার সদস্যের গবেষক দল। মাঠ পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি উদ্ভাবিত এ দুই জাতের সয়াবিনের অনুমোদন দিয়েছে। বশেমুরকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন মিয়া ২০শে আগস্ট অনুমোদনের কপি পান।

গবেষক দলের প্রধান অধ্যাপক আব্দুল করিম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কৃষক পর্যায়ে এর সঠিকতা যাচাইয়ের প্রয়োজন হয়। এজন্য নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ভোলায় বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ত জমিতে জাত দুটি রবি ও খরিপ মৌসুমে চাষ করা হয়। জাত দুটির গড় ফলন পাওয়া গেছে ৩ দশমিক ২ টন। বড়ো দানাবিশিষ্ট দুই জাতের উপযোগিতা যাচাইয়ের সময় দেশে বিদ্যমান সয়াবিনের অন্য জাতগুলো ৫-৮ ডেসিমিটার লবণাক্ততায় যেখানে হেক্টর প্রতি ২০০ থেকে ৪০০ কেজি ফলন দিয়েছে, সেখানে নতুন জাত দুটির সমপরিমাণ লবণাক্ততায় গড় ফলন ছিল ৮০০ থেকে ১ হাজার ১০০ কেজি। বিইউ সয়াবিন-৩ ও বিইউ সয়াবিন-৪ জাত দুটির এক হাজার বীজের ওজন যথাক্রমে ২২০ ও ২২৫ গ্রাম, যা দেশে বিদ্যমান যে-কোনো জাতের চেয়ে বেশি। উপাচার্য বলেন, ২০১৪ সালে আমরা বিইউ সয়াবিন-১ নামে খর্বাকৃতি ও অপেক্ষাকৃত কম সময়ে পরিপক্ব উচ্চফলনশীল এবং বিইউ সয়াবিন-২ নামে উচ্চফলনশীল, খরা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করেছি। উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় সয়াবিনের উৎপাদন বাড়াতে নতুন জাত দুটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

খাদ্য নিরাপত্তায় ব্রি-৯৮ জাতের আউশ

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, খাদ্য নিরাপত্তায় ব্রি-৯৮ জাতের আউশ ধান বিরাট ভূমিকা রাখবে। দেশে জনসংখ্যা বাড়লেও দিন দিন কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল এ দেশের ১৭ কোটি মানুষের খাদ্যের জোগান ঠিক রাখতে হলে একই জমি থেকে বছরে বার বার ফসল ফলাতে হবে। ফসল উৎপাদনও বেশি হতে হবে। সাধারণত ১৪০-১৬০ দিনের মধ্যে ধান হয়, সেই ধান যদি ৯০-১০০ দিনের মধ্যে হয়, তাহলে সেটি হবে বিরাট সম্ভাবনাময় ফসল। ব্রি-৯৮ আউশ ধান এই সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। ৯০-১০০ দিনের মধ্যে প্রতি বিঘায় ফলনও হচ্ছে ২৫ থেকে ৩০ মণ। এ জাতটি সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে খাদ্য নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে। কৃষিমন্ত্রী ১৯শে আগস্ট টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে মুশুদ্দি গ্রামে ব্রি-৯৮ জাতের আউশ ধানের ক্ষেত পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, উন্নত জাতের অভাব এবং খরা, বন্যা ও অতিবৃষ্টির ঝুঁকির কারণে দেশে এখন আউশ ধানের উৎপাদন অনেক কমে গেছে। বেড়েছে বোরো ও আমনের চাষ। ইতোমধ্যে আমাদের বিজ্ঞানীরা স্বল্পজীবনকালীন উন্নত জাতের আউশ ধান উদ্ভাবন করেছেন। ব্রি-৯৮ মাঠে খুবই সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। এ জাতটি মাঠ পর্যায়ে জনপ্রিয় করতে পারলে দেশে আউশ আবার বড়ো ফসলে পরিণত হবে। একইসঙ্গে এটি লাভজনক ফসল হিসেবে কৃষকের মুখে হাসি ফোটাবে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

‘সিঙ্গেল ইউজ’ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে কর্মপরিকল্পনা

একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া হয় (সিঙ্গেল ইউজ) প্লাস্টিকের এ ধরনের ব্যবহার বন্ধে তিন বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে আমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। সরকার প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে 'মাল্টিসেক্টোরাল অ্যাকশন প্ল্যান ফর সাসটেইনেবল প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ' বাস্তবায়ন করছে। অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন, পরিবহণ, বিক্রি, মজুতদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে সরকারের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর, পরিবেশবাদী সংগঠন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে বলেও জানান মন্ত্রী। ১৭ই আগস্ট পরিবেশ অধিদপ্তরে প্লাস্টিক দূষণ বন্ধে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। পরিবেশমন্ত্রী বলেন, উপকূলীয় অঞ্চলের ১২ জেলার ৪০টি উপজেলায় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে তিন বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সমুদ্রসৈকত ও তৎসংলগ্ন হোটেল-মোটেলে সিঙ্গেল ইউজ পাস্টিকের বিভিন্ন আইটেম পর্যায়ক্রমে বন্ধের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান।

তিনি জানান, ২০৩০ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশ 'ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল' ব্যবহার হ্রাস করা, ২০২৬ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা, ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য পুনঃচক্রায়ন নিশ্চিত করা, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সবাই একসঙ্গে কাজ করলে প্লাস্টিক দূষণ রোধে সফল হওয়া যাবে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্যাম্পেইন

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। ২৬শে আগস্ট রাজধানীর মিন্টু রোডে এই ক্যাম্পেইন হয়। মিন্টু রোডে সচিবদের বসবাসের জন্য আবাসিক কোয়ার্টার সচিব নিবাস, ঢাকা জেলা প্রশাসকের বাসভবনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অফিস থাকার পরও এই এলাকাকে হর্নমুক্ত করা যাচ্ছে না। যে যার মতো কারণে-অকারণে হর্ন বাজিয়ে চলেছেন। এই অবস্থায় পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন 'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প'-এর আয়োজনে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শব্দদূষণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে এই ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা। এ সময় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন যানবাহনে অযথা হর্ন না বাজানোর স্লোগানসংবলিত স্টিকার লাগানো হয় এবং পথচারী ও বাসচালকদের মধ্যে শব্দদূষণের বিভিন্ন তথ্যসংবলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়। নো হর্ন, শব্দদূষণ শ্রবণশক্তি নষ্ট করে, শব্দদূষণ বহুবিধ স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ, অযথা হর্ন না বাজাই—এ ধরনের স্লোগানসংবলিত প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন এবং ব্যানার নিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী ওই ক্যাম্পেইন করা হয়। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে এ ধরনের সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন কার্যক্রম অব্যাহত আছে উল্লেখ করে আয়োজকদের পক্ষ থেকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি ঘর পেয়ে শেষ হলো নৌকার জীবন

সিরাজুল ইসলামের বয়স ৬০ বছর। গত ২৬ বছর ধরে নদীতে নৌকায় ঘর বানিয়ে বসবাস করছেন। তার বাড়ি পাবনার বেড়া উপজেলার কৈটোলা গ্রামে। গত ২৯শে আগস্ট বেড়া উপজেলা প্রশাসন তাকে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের জায়গাসহ একটি ঘর বরাদ্দ দিয়েছে। স্ত্রীকে নিয়ে সেই ঘরেই বাস করছেন এখন।

সিরাজুল ইসলাম প্রায় ২৬ বছর আগে বার্জারস ডিজিজ রোগে আক্রান্ত হয়ে হাঁটু পর্যন্ত দুই পা হারান। দুই পা হারানোর পর হয়ে পড়েন পরিবারের বোঝা। এরপর বাস করা শুরু করেন বাড়ির পাশের কাগেশ্বরী নদীতে নৌকায়। ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে ২৬ বছর ধরে নদীতে মাছ ধরে কোনো রকমে সংসার চালাতেন।

সরকারের কাছ থেকে জায়গা ও ঘর পেয়ে সিরাজুল ইসলাম বলেন, ২৬ বছর গাঙে বাস কইর‍্যা ম্যালা কষ্ট করছি। আমার যে এই রকম একটা পাকা বাড়ি হবি তা স্বপ্নেও ভাবব্যার পারি নাই। এখন খাই না খাই, বাকি জীবনটা শান্তিতে বাস করব্যার পারবো। তার স্ত্রীও বলেন, সরকার আমাগরে এত সুন্দর ঘর দিছে। আইজ আমাগর আনন্দের সীমা নাই।

বেড়া উপজেলার ইউএনও মোহা. সবুর আলী বলেন, সিরাজুলের বিষয়টি আমাদেরকে জানানোয় সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানাই। তার মতো অসহায় মানুষকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারের ঘর দিতে পেরে আমরা খুবই খুশি।

উল্লেখ্য, গত ১৮ই জুন একটি পত্রিকার সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বেড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহা. সবুর আলী তখন সিরাজুল ইসলামকে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। মাত্র দুই মাসে কৈটোলা গ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি ঘরের চাবি সিরাজুল ইসলামের কাছে তুলে দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের তিন সিনেমা

দ্বিতীয়বারের মতো কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ২২ থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর পূর্বাঞ্চলীয় ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিস অব ইন্ডিয়ার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই ফেস্টিভ্যাল। এবারের আসরে মনোনীত হয়েছে বাংলাদেশের ৩টি চলচ্চিত্র। এগুলো হচ্ছে চলচ্চিত্র নির্মাতা খন্দকার সুমনের *সাঁতাও*, নূর ইমরান মিঠুর *পাতাল ঘর* এবং সৈয়দা নিগার বানুর *নোনা পানি*। ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিস অব ইন্ডিয়ার ভাইস চেয়ারম্যান প্রেমেন্দ্র মজুমদার জানান, বিশ্ব চলচ্চিত্রে দিন দিন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি হচ্ছে। তারই প্রতিফলন হিসেবে বিশ্বের নানা মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের একাধিক চলচ্চিত্রের অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে।

***প্রিয়তমা* ও *সুড়ঙ্গ* এবার ওটিটিতে**

ঈদুল আজহায় ২৯শে জুন সারা দেশে মুক্তি পায় হিমেল আশরাফের *প্রিয়তমা* ও রায়হান রাফির *সুড়ঙ্গ*। ছবি দুটি মাল্টিপ্লেক্সসহ সিঙ্গেল হলগুলোতে এখন পর্যন্ত দাপট অব্যাহত রেখেছে । এর মধ্যেই আসলো ওটিটিতে *প্রিয়তমা* ও *সুড়ঙ্গ* সিনেমা মুক্তির খবর।

২২শে আগস্ট থেকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের বায়োস্কোপে দেখা যাচ্ছে শাকিব খান অভিনীত বহুল আলোচিত *প্রিয়তমা* সিনেমাটি। অন্যদিকে, ২৪শে আগস্ট থেকে রাত আটটায় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে দেখা যাচ্ছে *সুড়ঙ্গ* সিনেমার নতুন ভার্সন (এক্সটেন্ডেড ডিরেক্টরস কাট)। চরকি ও আলফা আই স্টুডিওজের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই সিনেমার মধ্য দিয়ে বড়ো পর্দায় অভিষেক হয় আফরান নিশোর।

ইতোমধ্যে দুটি ছবির নামের পাশে 'ব্লকবাস্টার' তকমা জুটে গেছে। মাল্টিপ্লেক্সসহ দেশের সিঙ্গেল হলগুলোতে ৫৩ দিন ধরে চলার মধ্য দিয়ে হাফ সেঞ্চুরিও পূরণ করে ফেলেছে সিনেমা দুটি। স্টার সিনেপ্লেক্সের পাঁচ শাখায় আটটি শোসহ দেশের ৩৬টি হলে একযোগে চলেছে *প্রিয়তমা* এবং স্টার সিনেপ্লেক্সের ছয় শাখায় ১০টি শোসহ ১৬টি প্রেক্ষাগৃহে চলছে *সুড়ঙ্গ*।

৫৩ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও বড়ো পর্দায় এখনও যেসব দর্শক সিনেমাগুলো দেখেননি, তাদের জন্য আনন্দের বাতাবরণ নিয়ে এলো এই খবর। আলোচিত ছবি দুটি এবার ঘরে বসে মুঠোফোনেও দেখা যাবে, যা সিনেমা ও ওটিটির দর্শকের জন্য নিশ্চয়ই বাড়তি পাওয়া।

গানে-কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যশালা মিলনায়তনে 'কবিতা ও গানে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত অনুষ্ঠানে সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের 'আমার পরিচয়' কবিতার সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন কবিরা। কণ্ঠশিল্পীরা গাইলেন গান। পরিবেশিত হলো কবিতানির্ভর কোরিওগ্রাফি। এ সবই হলো জাতির পিতাকে নিবেদন করে। প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষে কথা, কবিতা ও গানে স্মরণ করা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ১৬ই আগস্ট জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'কবিতা ও গানে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক এই অনুষ্ঠান। নিজের লেখা কবিতা পাঠ করেন নির্মলেন্দু গুণ, মুহম্মদ নূরুল হুদা, আতাউর রহমান, মুহম্মদ সামাদ, শ্যামসুন্দর সিকদার, নাসির আহমেদ, তারিক সুজাত, ঝর্না রহমান প্রমুখ। কবিদের প্রত্যেকে পাঠ শুরুর আগে সংক্ষেপে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নিজের অনুভূতির কথা বলেন।

শুরুতেই মঞ্চে উঠে নাট্যকার আতাউর রহমান বলেন, নাটকের ভাষা আসলে কবিতার ভাষাই। নিজের লেখা দুটি কবিতা পাঠ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে কবি নির্মলেন্দু গুণ পাঠ করেন তাঁর 'আগস্ট শোকের মাস, কাঁদো' কবিতাটি। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা পড়েন 'জাতিপিতা' শিরোনামের কবিতা।

কবি মুহম্মদ সামাদ পড়ে শোনান নিজের লেখা কবিতা 'পিতা আজ আমাদের শাপমুক্তি'। পাঠের আগে কবি জানান, জাতির পিতার হত্যার রায়ের মুহূর্তটিকে কবিতায় ধরে রাখতেই তাঁর এই প্রয়াস। নিজের লেখা 'রক্তাক্ত সিঁড়ি' পড়েন শ্যামসুন্দর সিকদার।

কবি নাসির আহমেদের মতে, এ দেশে বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে একটি সচল সাহিত্যধারা সৃষ্টি হয়েছে। তিনিও তাঁর লেখা দুটি কবিতা পড়ে শোনান।

তারিক সুজাত পড়েন তাঁর কবিতা 'আমি আমার আঁতুড়ঘরে পথ হারালাম'। এছাড়াও আরও অনেকে তাদের নিজ নিজ গান, কবিতা ও নাচ পরিবেশন করেন।

এর আগে সভাপতির বক্তব্যে শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, ১৯৭৫ সালে জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পরে কবি-সাহিত্যিকরাই শিল্প-সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনিও নিজের লেখা একটি কবিতা পাঠ করেন।

বঙ্গমাতার ৯৩তম জন্মবার্ষিকী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয় ৮ই আগস্ট। বঙ্গমাতা ১৯৩০ সালের ৮ই আগস্ট তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম ছিল রেণু। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে তিনিও জাতির পিতার হত্যাকারীদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করেন।

দিবসটিতে সরকারি কর্মসূচি ছাড়াও আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন শ্রদ্ধা নিবেদন, আলোচনাসভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছে। এদিন সকাল আটটায় বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন, কোরান খতম, মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ, ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগসহ সহযোগী সংগঠনগুলো।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশ। এ লড়াই-সংগ্রাম-আন্দোলনের নেপথ্যে প্রেরণাদাতা ছিলেন বঙ্গমাতা। তিনি বঙ্গবন্ধুর গোটা রাজনৈতিক জীবন ছায়ার মতো অনুসরণ করে তাঁর প্রতিটি কাজে প্রেরণার উৎস হয়ে ছিলেন।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বিগ ব্যাশের ড্রাফটে তিন বাংলাদেশি

অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি লিগ বিগ ব্যাশের পরের আসরের ড্রাফটে নাম রয়েছে তিনজন বাংলাদেশি খেলোয়াড়ের। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এই লিগের ড্রাফটে আছেন বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম ও অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলা রিপন মণ্ডল। আর নারী বিগ ব্যাশের ড্রাফটে আছেন জাহানারা আলম। ২৮শে আগস্ট ২৯টি দেশের ৩৭৬ জন বিদেশি ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

বেতন বাড়ল নারী ফুটবলারদের

সাফজয়ী নারী ফুটবলারদের দাবি মেনে তাদের বেতন বাড়ালো বাফুফে। ১৬ই আগস্ট ৩১ জন নারী ফুটবলারকে চুক্তির আওতায় এনে তাদের বেতন বাড়ানো হয়। এর মধ্যে অধিনায়ক সাবিনা খাতুনসহ ১৫ জন বেতন পাবেন মাসে ৫০ হাজার টাকা করে। বাকি ১৬ জনের মধ্যে ১০ জন ৩০ হাজার টাকা করে এবং ছয়জন প্রতি মাসে ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা বেতন পাবেন। ছয় মাসের চুক্তি কার্যকর হবে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে। আগে সাবিনা বেতন পেতেন ২০ হাজার। অন্যরা ১০ হাজার টাকা করে।

প্লেট গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন আরাফাত

এশিয়ান জুনিয়র স্কোয়াশের প্লেট গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশের আরাফাত মোল্লা। ২০শে আগস্ট চীনের দালিয়ানে হওয়া আসরের অনূর্ধ্ব-১৩ গ্রুপের প্লেট ফাইনালে আরাফাত ৩-২ ব্যবধানে হারিয়েছে হংকংয়ের তাং ওয়াই হংকে। ফাইনালে উঠতে আরাফাত হারায় কাতার, চীন ও মালয়েশিয়ার তিন প্রতিযোগীকে। মূল ইভেন্টের প্রথম রাউন্ডে আরাফাতের খেলা পড়েছিল মালয়েশিয়ার লোকেশ উইগেনেশ্বরনের বিপক্ষে। সেই ম্যাচে ৩-০ গেমে হারলেও প্লেট ইভেন্টে টানা জিতেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আরাফাত। আসরে বিভিন্ন ইভেন্টে বাংলাদেশের আরও তিনজন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছে। তবে প্রথম আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলতে নেমেই বাজিমাত করেছে আরাফাত। টুর্নামেন্টে এশিয়ার ১৬ দেশের ২২৬ জন খেলোয়াড় অংশ নেয়।

শাটলারদের তিন স্বর্ণজয়

সাউথ এশিয়ান জুনিয়র ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে ২২শে আগস্ট একক ইভেন্টে তিনটি স্বর্ণসহ নয়টি পদক জিতেছেন বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা। এর দুদিন আগে একটি করে রুপা ও ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন লাল-সবুজের শাটলাররা। নেপালের কাঠমান্ডুতে

অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে বালক এককের ফাইনালে এসএসএম সিফাত উল্লাহ শ্রীলংকার থিদাসা বেরাগোদাকে, বালক দ্বৈতে সিফাত উল্লাহ ও রাজন মিয়া জুটি নেপালের কবির কেসি ও অভয় মাহারা জুটিকে এবং অনূর্ধ্ব-১৫ বালক একক ইভেন্টের ফাইনালে বাংলাদেশের ওয়ালি উল্লাহ স্বদেশি মোস্তাকিম হোসেনকে হারিয়ে স্বর্ণ জেতেন। মোস্তাকিম রুপা পান। অনূর্ধ্ব-১৫ বালক দ্বৈতে মোস্তাকিম ও ওয়ালি উল্লাহ জুটি রুপা এবং অনূর্ধ্ব-১৭ মিশ্র দলগতে রাজন মিয়া ও সিনথিয়া খানম জুটি, অনূর্ধ্ব-১৫ বালিকা দ্বৈতে ও মিশ্র দ্বৈতে দুটিসহ চারটি ব্রোঞ্জ জিতে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

না ফেরার দেশে কাজী পেয়ারার উদ্ভাবক ড. কাজী বদরুদ্দোজা

আফরোজা রুমা

দেশের খ্যাতনামা কৃষি বিজ্ঞানী কাজী পেয়ারার উদ্ভাবক জাতীয় ইমেরিটাস বিজ্ঞানী ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ৩০শে আগস্ট রাজধানীর ক্রিসেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

কৃষিবিজ্ঞানী ড. বদরুদ্দোজা ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারি বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের অধীনে বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট (বর্তমান শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে পড়াশোনা করেন। স্বল্প পরিচিত ফসল গম ও ভুট্টা চাষ সম্পর্কে জানার জন্য সুইডেনের বিশ্বখ্যাত স্তালভ গবেষণা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নেন তিনি।

এছাড়া পরে স্কলারশিপ পেয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান বিভাগীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুমোদনে এগ্রিকালচার রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে কর্মজীবন শুরু করেন। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিলের পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক ও মহাপরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে তিনিই প্রথম বাংলাদেশে উচ্চ ফলনশীল গম প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেন। ১৯৫৭ সালে তিনি ইকোনমিক বোটানিস্ট (ফাইবার) পদ লাভ করেন। তিনি পেয়ারার একটি জাত উদ্ভাবন করেন, যা তাঁর নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে 'কাজী পেয়ারা'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে পাকিস্তান কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালকের পদ পরিত্যাগ করে ১৯৭৩ সালে ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা দেশের কৃষি গবেষণার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তিনি কৃষি গবেষণার সংস্কার, উন্নয়ন ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর হাত ধরেই স্বাধীন বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি গবেষণার বুনিয়াদ রচিত হয়। ধানের বাইরে দেশের প্রধান দুটি দানাদার ফসল চাষ শুরুর ক্ষেত্রেও এই মানুষটি নেতৃত্ব দেন। ভুট্টার বাণিজ্যিক আবাদ তাঁর হাত দিয়েই শুরু। ভুট্টা থেকে তেল উদ্ভাবন এবং তা পোলট্রি শিল্পের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার শুরুর ধারণাটিও তাঁর কাছ থেকে আসা। ছত্রাকের 'কাজিবোলেটাস' নামকরণও করা হয় তাঁর নাম থেকে।

দেশের কৃষি গবেষণায় অবদানের জন্য তিনি ২০১২ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কারে' ভূষিত হন। বরেণ্য এই কৃষিবিজ্ঞানী ড. কাজী এম বদরুদ্দোজার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। ৩১শে আগস্ট সকাল ৯টায় ফার্মগেট কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে গাইবান্ধায় নিজ গ্রামে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

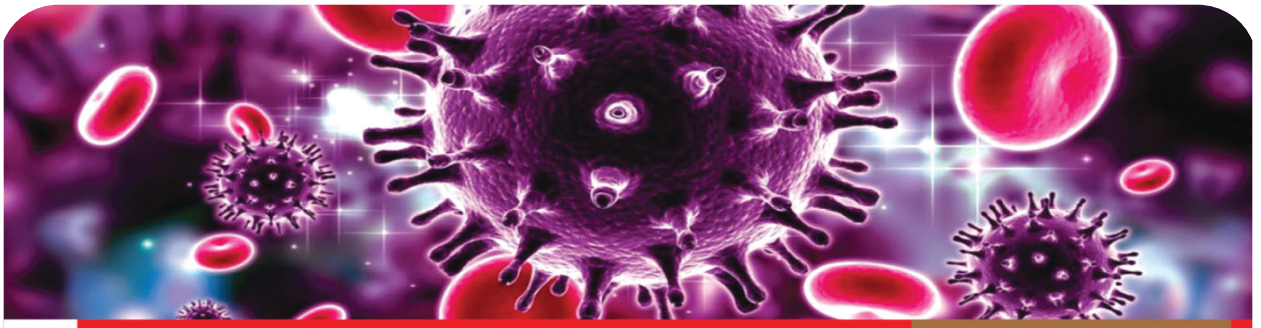

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- হঠাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 44, No. 03, September 2023, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd